

অলীগণ কবরে জীবিত কি?



আব্দুর রাকীব (মাদানী)

অলীগণ কবরে জীবিত কি?
আব্দুর রাকীব (মাদানী)

অলীগণ করবে জীবিত কি?

লেখক: আব্দুর রাকীব (মাদানী)

লিসান্স, (ইসলামিক-ল-) মদীনা বশ্ববিদ্যালয়
এম. এ. (এরাবিক) জামিয়া মিল্লিয়া নতুন দিল্লি
দাঈ, দাওয়া সেন্টার, খাফজী, (সউদী আরব)

সম্পাদনা:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফায়যী

ও

শাইখ আব্দুল হাই



প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

অলীগণ করবে জীবিত কি?

লেখক: আব্দুর রাকীব (মাদানী)

লিসাস, (ইসলামিক-ল-) মদীনা বশ্ববিদ্যালয়
এম. এ. (এরাবিক) জামিয়া মিল্লিয়া নতুন দিল্লি
দাঈ, দাওয়া সেন্টার, খাফজী, (সউদী আরব)

**সম্পাদনা: শাইখ আব্দুল হামীদ ফায়যী
ও শাইখ আব্দুল হাই**

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুনানহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০১৩

প্রচ্ছদ: মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান

মূল্য: ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

অর্থায়ন: শাইখের কতিপয় ছাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স.

৩০/২, হেমেদ্র দাস লেন, ঢাকা

ভূমিকা

সমস্ত প্রসংশা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্যে অতঃপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের প্রতি।

আমরা যদি কখনো কোন দরগাহ-মাযার এবং এসব স্থানে আগমনকারী লোকদের সম্পর্কে গভীর মনে চিন্তা করি যে, তারা মাযারস্থ ও কবরস্থ কল্পিত অলীদের নিকট কিছু চাওয়া-পাওয়ার আশায় কেন ছুটে আসে; অথচ সেই সকল অলী বহু পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। তারা কবরস্থ অলীদের শরণাপন্ন হয়, তাদের আন্তরিকভাবে ভালবাসে, তাদের মাধ্যমে নিজের সমস্যার সমাধান কামনা করে, তাদের খুশি করার জন্য নয়রানা পেশ করে, তাদের কবরগুলিকে সুসজ্জিত করে, উপরে গম্বুজ নির্মাণ করে, এসব স্থানকে মসজিদ বা মসজিদের থেকে অধিক সম্মান করে; অথচ এসব কথিত অলীদের অতীতে মৃত্যু হয়েছে, তাইতো তাদের কবর দেয়া হয়েছে। এসবের রহস্য কি? বা এসবের প্রকৃত কারণ কি?

তাহলে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এ সবের পিছনে যেই মূল কারণ বা আকীদাহ-বিশ্বাস পাওয়া যায়, তা হচ্ছে : ‘অলীগণ মৃত্যুর পরেও কবরে জীবিত আছেন’।

এই প্রকার লোকেরা বিশ্বাস করে বা তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, যারা অলী তারা মরে না, তারা কবরেও জীবিত। আর অনেকে তো এক ধাপ এগিয়ে এও বিশ্বাস করে যে, অলীদের কবরের জীবন পৃথিবীর জীবনের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ, অধিক শক্তিশালী।

যতক্ষণ তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস উপস্থিত থাকবে, ততক্ষণ কবরকে কেন্দ্র করে যতসব শেরেকী কার্য-কলাপ ঘটছে তা বন্ধ হবে না। তারা কবরস্থ অলীদের জীবিত বিশ্বাস করছে বলেই তাদের শরণাপন্ন হচ্ছে, তাদের আহ্বান করছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে উপঢৌকন পেশ করছে। আর মনে মনে ভাবছে, অলীগণ কবরের ভিতর অবস্থান করলেও যেহেতু তারা জীবিত, সেহেতু তারা আমাদের প্রার্থনা ও আবেদন-নিবেদন শুনতে পাচ্ছে। অতঃপর তারা স্বয়ং আমাদের কল্যাণ করছে কিংবা অসীলা (মাধ্যম) হয়ে কল্যাণ করিয়ে দিচ্ছে।

আমি মনে করি, দরগাহ-খানকাহ, মাযার এবং কবরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত শেরেকী কার্য-কলাপের মূলোৎপাটন করতে হলে তাদের যে জ্ঞান দেয়ার প্রয়োজন আছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতর হচ্ছে : “অলীগণ কবরে অন্যান্য লোকদের মতই মৃত”। যেমন অন্যান্য কবরস্থ মৃতরা শুনে না, দেখে না এবং উপকার ও অপকার করতে পারে না, তেমন তারাও অক্ষম-এই আকীদাহ বা বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়া। তাদের মস্তিষ্কে এই বিশ্বাস স্থান পেলে বাকি বিষয়গুলি সহজে নির্মূল হতে পারে। আর এই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকটির অবতারণা।

বক্ষ্যমাণ পুস্তকটিতে তাদের আকীদা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাদের বিশ্বাস : অলীরা কবরে জীবিত। অতঃপর বলিষ্ঠ ভাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এই বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকটিতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিকের কিছু নয়। তাই জ্ঞানী মহল কর্তৃক গঠনমূলক

সংশোধনী পেলে তা অবশ্যই গৃহীত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংযোজিত হবে ইনশাআল্লাহ।

এই মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি, মাননীয় শায়খ আব্দুল হামীদ ফায়যী (দাঈ, আল-মাজমাআহ দা'ওয়া সেন্টার) ও শাইখ আব্দুল -হাই (দাঈ, পুরাতন সানাইয়্যাহ দা'ওয়া সেন্টার, রিয়াদ) সাহেব দ্বয়কে, যাঁরা বিভিন্ন কর্ম ব্যস্ততার ফাঁকে আন্তরিকতার সাথে পুস্তকটির সংশোধনে যথা সাহায্য করেছেন। (জাযাহমুল্লাহু খাইরান)

পরিশেষে অতি দয়ালু মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে গ্রহণ করেন এবং আমার, আমার আক্বা-আম্মা এবং পরিবার-পরিজনের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় করেন। আমীন!!

সূচিপত্র

| | |
|---|----|
| প্রথম অধ্যায়: গোড়ার কথা | 11 |
| অলীগণ মৃত্যুবরণ করেন না, কাদের বিশ্বাস? | 11 |
| এই বিশ্বাসের কতিপয় উদাহরণ। | 12 |
| অলীদের অলী খিজির (ﷺ) নাকি এখনও জীবিত! | 13 |
| খিজির (ﷺ) জীবিত এই বিশ্বাসে সূফীবাদ এবং শিয়ামতবাদের মিল। | 15 |
| অলীগণ কবরে জীবিত এই বিশ্বাসের আড়ালে | 16 |
| এরা নবীগণের নাম দিয়ে পড়ে নিচ্ছে। | 18 |
| দ্বিতীয় অধ্যায়: নবী, রাসূল এবং অলীর সংজ্ঞা, তাদের সম্মান এবং চিরঞ্জীব কে? তার বর্ণনা। | 19 |
| রাসূল, নবী ও অলীর সংজ্ঞা। | 19 |
| অলী কাকে বলে? শরীয়তের পরিভাষায় অলী। | 20 |
| নবী ও অলীর মধ্যে পার্থক্য। | 22 |
| চিরঞ্জীব শুধুমাত্র মহান আল্লাহ। | 23 |
| তৃতীয় অধ্যায়: কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নবী ও রাসূলদের মৃত্যুর প্রমাণ। | 24 |
| কুরআনের আলোকে সুলায়মান (ﷺ) এর মৃত্যু। | 24 |
| মূসা (ﷺ) এর মৃত্যু। | 26 |
| একটি আপত্তি ও তার জবাব। | 27 |
| ইয়াকুব (ﷺ) এর মৃত্যু। | 27 |
| সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যু। | 28 |
| বুখারী শরীফের আলোকে নবী (ﷺ) এর মৃত্যু এবং | 30 |

| | |
|---|----|
| কাফনদফন । | |
| সমস্ত নবীগণের মৃত্যু । | 33 |
| অলী, সাধারণ মানুষ এবং সকল জীবের মৃত্যু । | 33 |
| মরণ সম্পর্কে দার্শনিকদের দর্শন “মানুষ মাত্রই মরণশীল” । | 34 |
| আপত্তি: অলীদের মরণ তো হয়েছে কিন্তু পুনরায় তারা আবার জীবিত হয়েছেন । | 35 |
| চতুর্থ অধ্যায়: মৃত্যুর পর অলীগণের ক্ষমতা !? এ বিশ্বাসের খণ্ডন । | 36 |
| অসাধারণ ও অতিরিক্ত ক্ষমতার বর্ণনা । | 36 |
| এই বিশ্বাসের খণ্ডন । | 37 |
| অলীদের সাধারণ ক্ষমতার বর্ণনা । | 39 |
| এই বিশ্বাসের খণ্ডন । | 39 |
| নবী ঈসা (ﷺ) এর অজ্ঞতা ও অক্ষমতা । | 39 |
| বর্তমানে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর উম্মতের কৃতকর্মের সম্বন্ধে অজ্ঞ । | 41 |
| একটি ভাববার বিষয়! | 42 |
| পঞ্চম অধ্যায়: বরযখী জীবনে নবী, শহীদ ও অলীগণ । | 43 |
| বরযখী জীবন বলতে কি বুঝায় ? | 43 |
| জীবনের স্তরসমূহ । | 44 |
| বরযখী জীবন অদৃশ্য তথা গায়েবী জীবন । | 46 |
| বরযখী জীবনের আরো কিছু কথা । | 47 |
| বরযখী জীবন দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনীয় নয় । | 48 |
| বরযখী জীবনে সম্মানিত নবীগণের অবস্থা । | 49 |
| বরযখী জীবনে শহীদগণের অবস্থা । | 50 |

| | |
|---|----|
| বরযথী জীবনে অলীগণের অবস্থা । | 51 |
| ষষ্ঠ অধ্যায়: অলীগণ করবে জীবিত, এই মতের দলীলাদির পর্যালোচনা | 52 |
| প্রথম সংশয়: তারা বলে: অলীগণ মারা যায় না... | 52 |
| দ্বিতীয় সংশয়:শহীদগণ জীবিত থাকলে অলীগণ জীবিত থাকবেন না কেন ? | 53 |
| তৃতীয় সংশয়: ...জীবিত না থাকলে কবরবাসীরা সালামের উত্তর কিভাবে দেয় । ... | 54 |
| চতুর্থ সংশয়: ...জীবিত আছেন বলেই মাইয়েতরা জুতার আওয়াজ শুনে... | 56 |
| পঞ্চম সংশয়: ...যেহেতু নবীজী জীবিত আছেন তাই তাঁর উত্তরাধিকারী অলীরাও জীবিত আছেন... | 57 |
| ষষ্ঠ সংশয়: অলীরা জীবিত তাই অনেক সময় সতেজ লাশ পাওয়া যায় । | 58 |
| অনেকে অপবাদ দিবে । | 59 |
| উপসংহার | 61 |
| গ্রন্থপঞ্জী | 62 |

গোড়ার কথা

ক- অলীগণ মৃত্যুবরণ করেন না, কাদের বিশ্বাস ?

এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহর যত নিয়ম বিরাজ করছে তন্মধ্যে একটি চির সত্য নিয়ম হচ্ছে, “জীবন যেখানে, মরণ সেখানে”। অর্থাৎ যার মধ্যে জীবন আছে তার মরণ অবশ্যই আছে। এ কারণে আমরা পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাই না, যার বয়স হাজার বছর কিংবা পাঁচশত বছর। এমন কি দুই শত বছরের বয়স্ক লোককেও দেখা যায় না। সাধারণতঃ শেষ নবীর উম্মত এক শত বছরের মধ্যে মারা যায়। নবী (ﷺ) বলেছেনঃ “আমার উম্মতের বয়স (সাধারণতঃ) ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে, খুব কম সংখ্যকই এই সীমা অতিক্রম করবে”। [তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দাওয়াত অনুচ্ছেদ নং ১১৩ হাদীস নং ৩৭৮৪/ ইবনু মাজাহ নং ৪২৩৬]

কিন্তু নবী ভক্তের দাবীদার এক সম্প্রদায় এমনও আছে, যাদের বিশ্বাস এই চির সত্যের বিপরীত। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, বিগত অলীগণ মৃত্যুবরণ করেন নি। তারা অলীগণের ক্ষেত্রে মৃত্যু শব্দটি বলা বড় অপরাধ এবং বেআদবী মনে করে। তাদের এই আক্বীদাটি তারা সংক্ষিপ্তাকারে এই ভাবে বলে থাকে : ‘নবী ও অলীরা মরে না’। আর অনেকে এই বিশ্বাসকে হায়াতুল্লবী কিংবা হায়াতুল্ আউলিয়া আখ্যা দিয়ে থাকে।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে যারা এই আক্বীদা রাখেন, তাঁরা হলেন সূফীবাদী। তবে ‘সূফীবাদ’ শব্দটি একটু অস্পষ্ট শব্দ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বাহ্যত মনে হয় সূফীইজম একটিই প্লাটফর্ম, যাদের চিন্তা-ধারা আক্বীদা ও বিশ্বাস হয়তঃ এক। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সত্য হচ্ছে, সূফীবাদ বহু তরীকায় বিভক্ত। উল্লেখযোগ্য তরীকাসমূহের

মধ্যে যেমন : ক্বাদেরী তরীকা, নক্শবন্দী তরীকা, চিশ্তী তরীকা, রেজভী তরীকা, শাযেলী তরীকা, মাইজ ভাণ্ডরী তরীকা প্রভৃতি। উল্লেখিত প্রত্যেক তরীকার আছে নিজস্ব কিছু আকীদা, আমল ও নিয়ম-পদ্ধতি, যা এক অপরের সাথে আদৌ মিল রাখে না। তবে প্রশাখা বিশিষ্ট সূফীবাদ যে বিষয়ে এক ও অভিন্ন আকীদা রাখে তা হচ্ছে, নবী ও অলীর মৃত্যু বরণ করে না। অর্থাৎ এটা হচ্ছে সূফীবাদ তথা পীরবাদের আকীদা ও বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের কতিপয় উদাহরণঃ

তাদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে উদাহরণ উপস্থাপন যে করতেই হবে এমনটা জরুরী নয়। কারণ তারা তাদের এই আকীদা প্রকাশ্যেই বলে থাকে এবং প্রচার করে থাকে। তবুও পাঠক ভাইদের জ্ঞাতার্থে কিছু উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক- ব্রেলভী তথা রেজভী মতবাদের বিশিষ্ট ইমাম আহমদ রেজা খান বলেন : ‘ আউলিয়ায়ে কেরাম আপনী কাবরোঁ মৈঁ পাহলে সে যিয়াদাহ সাম্ ও বাস্‌র রাখতে হ্যাঁ ’। অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম নিজ কবরে পূর্বের চেয়ে অধিক শোনা এবং দেখার ক্ষমতা রাখেন। [হেকায়েতে রিজভিয়াহ, খলীল বারকাতী পৃঃ ৪ এর বরাতে ইসলাম মৈঁ বিদআত ও য়ালালাত কে মুহাররিকাত পৃঃ ২৫৭]

খ- ব্রেলভী মতবাদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বাহারে শরীযতে উল্লেখ হয়েছে, ‘আউলিয়াই কেরাম আপনি কবরোঁ মৈঁ হায়াতে আবাদী কে সাথে যিন্দাহ হ্যাঁয়। উনকে ইলম ও ইদরাক আউর সাম্ ও বাস্‌র পহলে কি বা নিসবাত বহুত যিয়াদাহ ক্বাবী হ্যাঁ ’। অর্থাৎ আউলিয়াই কেরাম নিজ কবরসমূহে চিরন্তন জীবনের সহিত জীবিত আছেন। তাদের জ্ঞান ও অনুভূতি এবং শ্রবণ ও দর্শন পূর্বের তুলনায় অনেক শক্তিশালী’। [বাহারে শরীযত/৫৮]

গ- অন্য এক জন বলেন : ‘ আশীয়া, শুহাদা আউর আউলিয়া মাআ আপনে আবদান ও আক্ফান যিন্দাহ হোয়ায়’। অর্থাৎ নবীগণ, শহীদগণ এবং অলীগণ নিজ কাফন ও শরীর সহ জীবিত আছেন’।

[আহকামে কবরুল মুমেনীন রিসালাহ রিযভিয়াহ পৃঃ ২৩৯, পাকিস্তানে ছাপা]

এ বিষয়ে আরো তথ্য দেখুন : ইসলাম মেঁ বিদআত ও যালালাত কে মুহাররিকাত পৃঃ ২৫৭-২৫৯।

অলীদের অলী খিজির (ﷺ) নাকি এখনও জীবিত !

সূফীবাদের আকীদানুযায়ী অলীদের মৃত্যু হয় না। এর প্রমাণে তাদের কাছে রয়েছে অনেক ঘটনা। তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হচ্ছে খিজির (ﷺ) এর বর্তমানে জীবিত থাকার ঘটনা। তাদের আরো বিশ্বাস যে, খিজির (ﷺ) এর সাক্ষাৎ বিনে কামেল অলী হওয়া যায় না। খিজির হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব যাঁর সাক্ষাৎ ঈসা (ﷺ) এর জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মূসা (ﷺ) এর সাথে “মাজমাউল বাহরাঈন” নামক স্থানে হয়। সেই খিজির নাকি এখনও জীবিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নাকি বিশেষ অলীদের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকেন। নিম্নে বিষয় বস্তুর কাহিনি শুনুন।

১- একদা এক চোর বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর ঘরে চুরি করতে ঢুকলে বড়পীর তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে চোরকে গৃহমধ্যেই বন্দী করে ফেলেন। চোর এই দুর্দশায় পড়ে নিজেকে নানাভাবে ধিক্কার দিতে লাগে। সকাল হলে আমার শান্তি যে কি হবে! তার পর লাঞ্ছনা তো আছেই। ঘরের কোনে বসে চোর যখন এইরূপ অনুশোচনায় অস্থির। তখন ঘটলো আর এক ঘটনা। হযরত খিজির (ﷺ) হযরত বড়পীরের কাছে আসলেন এবং জানালেন যে, অদ্য এক জন আবদাল ইন্তেকাল করেছে। (সূফীবাদের নিকট আবদাল এক বিশেষ অলীসম্প্রদায় যাঁরা মানুষের অগোচরে পৃথিবী পরিচালনা ও শাসনকার্য চালান)। খিজির

(ﷺ) বললেন : সেই মৃত আবদালের পরিবর্তে তার দায়িত্ব পালন করার জন্য এক জন আবদালের প্রয়োজন। হযরত বড়পীর সেই বন্দী চোরকে ডেকে তার প্রতি একবার দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলে চোরটি ইলমে মারেফাতের জ্ঞানে পরিপুষ্ট হয়ে গেল এবং তাকে আবদাল পদে নিযুক্তি প্রদান করা হল। হযরত খিজির (ﷺ) তখন আবদাল কে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

[হযরত বড়পীর (রহ) জীবনী, মাওলানা মায়হার উদ্দিন, ১০৯-১১০ পৃঃ]

২- মুহাম্মদ আলী তিরমিযী একদা এক কবরস্থানে বৃক্ষের নিচে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে কাঁদছিল এবং চিন্তা করছিল যে, আমার বন্ধু কিছু দিন পর জ্ঞান অর্জন করে ফিরবে এবং সম্মান পাবে আর আমি অজ্ঞই থেকে গেলাম। অকস্মাৎ এক নূরানী আকৃতির লোক প্রকাশ পায় এবং সে বলে : তুমি জ্ঞান অর্জন করতে চাও ? সে বলে জি হ্যাঁ ! তখন সে বলে তাহলে প্রত্যহ তুমি আমাকে এখানে পাবে। আমি তোমাকে শিক্ষা দেব। এইরূপ আলী মুহাম্মদ তিরমিযী তিন বছর ধরে সেই স্থানে তার কাছ থেকে ইলম হাসেল করতে থাকে। শেষে সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে : আমি আল্লাহর বান্দা খিজির। তুমি তোমার আম্মাকে কখনোও কষ্ট দেওনি বলে আমাকে তোমার শিক্ষাদানে নিয়োজিত করা হয়েছিল।

[শরীয়াত ও তরীকত, মাওলানা আব্দুর রহমান কিলানী, পৃঃ ২৩০]

৩ - আবু বকর ওয়াররাক নামক অলীর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, খিজির (ﷺ) এর সাথে সাক্ষাৎ পাওয়ার তার খুবই আশা ছিল। যার কারণে সে প্রতিদিন কবরস্থানে যেত এবং যেতে যেতে রাস্তায় এক পারা কুরআন মজীদ পড়তো। একদিন সে নিজ বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্রই এক নূরানী বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত পায়। সেই লোকটি বলে : আপনি যদি অনুমতি দেন তো কিছুটা সময় আপনার সাথে অতিবাহিত করতে চাই। ওয়াররাক অনুমতি দেয়। সেই লোকটি ভাল ভাল কথা-বার্তা বলতে বলতে কবরস্থান পর্যন্ত তার সাথে যায়। সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় সে বলে :

ওয়াররাক তুমি কি আমাকে চিনতে পারলে আমি কে ? আমি হচ্ছি খিজির (ﷺ) অনেক দিন ধরে আমার সাক্ষাৎ কামনা করতেছিলে আজ তা সম্পন্ন হল । [শরীয়ত ও তরীকত/২৩০-২৩১]

বর্ণিত তিনটি ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বের খিজির এখনও জীবিত । এই বিশ্বাস পীরবাদে আছে । তাছাড়া এখনও অনেক সূফীকে মদীনায় খিজির খুঁজতে দেখা যায় । তারা মুসাফাহ করার সময় মানুষের বুড়ো আঙ্গুল টিপে । তাদের ধারণা, যে নাকি খিজির হবে তার বুড়ো আঙ্গুল হাড় বিহীন হবে ।

খিজির (ﷺ) জীবিত এই বিশ্বাসে সূফীবাদ এবং শিয়া মতবাদের মিল ।

খিজির (ﷺ) এখনও জীবিত এর সপক্ষে সূফীবাদের কয়েকটি কাহিনী শুনলেন । অনুরূপ বিশ্বাস শিয়া সম্প্রদায়েরও । তারাও কেচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে তাদের ইমাম ও খিজির (ﷺ) কে জীবিত প্রমাণের চেষ্টা করে থাকে । শিয়া মতবাদের এই ঘটনাটি জামকারান মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত । জামকারান মসজিদটি বর্তমান ইরানের কুম শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । কেচ্ছা বর্ণনাকারী হাসান বিন মুসলা জামকারানী বলেন : “৩৯৩ হিজরী সনে ২৭ই রমযানে আমি আমার ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম । অর্ধরাত অতিবাহিত হলে দরজায় এক শব্দ হয়, ফলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় । একটি ডাক আমাকে সম্বোধন করে বলছিল : ওঠো এবং ইমাম মাহদীর (শিয়াদের সর্বশেষ ১২তম ইমাম যিনি সিরদাব নামক গুহায় লুকিয়ে আছেন, সময় হলে বের হবেন) ডাকে সাড়া দাও । সে তোমাকে ডাকছে । দরজার কাছে আসলে এক প্রকার সং প্রকৃতির লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয় । তারা আমাকে মসজিদের পশ্চিমদিকের আবাদী জমির নিকট নিয়ে যায় । সেখানে পৌঁছানোর পর আমি যুগের মালিককে (মাহদীকে) ৩০ বছরের যুবকরূপে দেখতে পাই, যার মুখমণ্ডলের জ্যোতি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়

প্রকাশিত হচ্ছিল। তিনি তাঁর পালংকে বালিশের উপর ভর দিয়ে বিরাজমান ছিলেন। তাঁর সম্মুখে ছিলেন এক বুয়ুর্গ জ্ঞানী ব্যক্তি। তাঁর হাতে ছিল একটি গ্রন্থ, যা তিনি মাহদীকে পড়ে পড়ে শুনাইছিলেন। পাশে সাদা ও সবুজ কাপড় পরিধানকৃত একজন ষাটের অধিক বয়স্ক লোক ছিল। তারা সেই পবিত্র স্থানে নামায পড়ছিল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে তাদের নিকটে গিয়ে সালাম পেশ করলাম। সেই বিজ্ঞ লোকটি ছিলেন খিজির (عليه السلام)। তিনি হাসিমুখে আমার সালামের উত্তর দেন এবং তাঁর নিকটে বসান। অতঃপর ইমাম মাহদী (عليه السلام) আমাকে আমার নাম ধরে সম্বোধন করে বলেন : এটি পবিত্র স্থান। আমরা চাই এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ হোক। আর তোমার প্রতি এর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হল

”। [মাতা ইয়াশরিকু নূরুকা আইয়ুহাল্ মুত্তাযার ? (হে প্রতীক্ষিত তোমার জ্যোতি কবে প্রকাশ পাবে ? লেখকঃ উসমান বিন মুহাম্মদ আল্ খামীস পৃঃ ১২৭-১৩০]

পাঠক সমাজ ! এসব ঘটনা যাচাই-বাছাইয়ের অপেক্ষা রাখে এবং অনেকাংশই প্রশ্নের আওতায়। কিন্তু আমি আপনাদেরকে এখানে শুধু এতটুকু জানাতে চাচ্ছি যে, পীরতন্ত্রে অলীরা যে মারা যায় না এর প্রমাণে এসব কেচ্ছা কাহিনি স্বয়ং তাদের রচিত। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে পীরবাদ যেমন খিজির (عليه السلام) কে এখনও জীবিত মনে করে, অনুরূপ শিয়া মতবাদও বিশ্বাস করে। আর এই ঘটনাটিই হচ্ছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অলীগণ করবে জীবিত, এই বিশ্বাসের আড়ালে :

পীর ও অলীরা মরে না বরং তাদের কবরের জীবন পৃথিবীর জীবনের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক শক্তিশালী। এই বিশ্বাসটির উপর টিকে আছে এবং আবাদ হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দরগাহ, খানকাহ ও মাযার। দরগাহ ও মাযারের ধর্তা-কর্তারা জনসাধারণদের এ কথাই বুঝায় যে, অলীরা মরে না। শুধু এতটুকুই নয় বরং মরা শব্দটি তাদের শানে উচ্চারণ করাই নাকি হারাম।

আর এ কারণেই জনসাধারণেরা ছুটে যায় সেখানে। যেহেতু তাঁরা মারা যায়নি, সেহেতু তাঁরা আমাদের আবেদন নিবেদন শুনতে সক্ষম। যেহেতু মরণের পর তাঁদের জীবন দুনিয়ার তুলনায় বেশি পূর্ণাঙ্গ, তাই জীবিতাবস্থায় পীর বাবা যা দিতে পারেনি মৃতাবস্থায় তা দিতে সক্ষম। অন্যদিকে সেই ধারণা তো আছেই যে, জনসাধারণেরা নগণ্য ও তুচ্ছ বান্দা আর পীর বাবারা হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও তাঁর বন্ধু। আমাদের মত নগণ্য বান্দাদের আবেদন-নিবেদন কি তিনি সরাসরি শুনেন, যতক্ষণে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অসীলা ধরা না হয়? তাই মাযারস্থ পীর বাবাকে অসীলা করার আগে তার সম্ভ্রষ্টির উদ্দেশ্যে নয়র-মান্নত এবং দান-খয়রাত দেয়াটা শুধু ভাল মুরীদের পরিচয় নয় বরং মনের ইচ্ছা পূরণের আবশ্যিক উপকরণ। আর এটাই হচ্ছে মাযার জগতের আয়ের আসল উৎস।

মোট কথা, যদি প্রমাণিত হয় যে, কবরস্থ অলীগণ সাধারণ মানুষদের মত মৃত, তাহলে সেদিন থেকেই পৃথিবীর সমস্ত চকচকে দরগাহ চুপসে যাবে, রমরমা উরুস-মেলা জনশূন্যে পরিণত হবে এবং বিনা পুঁজির এই ব্যবসা উঠে যাবে। কারণ সাধারণ মৃতরা যেমন শুনে না, দেখে না, নড়া-চড়া করতে পারে না, অনুভূতি শক্তি থাকে না বরং দেহ পচে সড়ে মাটির সাথে মিশে যায়, তেমন মৃত্যুর পর যদি অলীদের অবস্থা হয়, তাহলে সামান্য জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিও দরগাহ ও মাযারের দিকে ঞ্জপ করবে না। আর এই অবস্থা হলে হাজারো মাযারের অভিভাকদের অবস্থা কি হবে একটু চিন্তা করুন। বিনা পরিশ্রমের এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধুর জীবন কে হাত ছাড়া করতে চায়! সে কারণে বলা হয় নবী ও অলীগণ মৃত্যু বরণ করেন না, তারা কবরেও জীবিত বরং পৃথিবীর জীবনের তুলনায় অধিক পূর্ণাঙ্গ ও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন !!

এরা নবীগণের নাম দায়ে পড়ে নিচ্ছে:

মাযারপন্থী লোকেরা যখন এই কথা বলেছে যে, পীর বাবারা তথা অলীরা কবরে জীবিত তখন, সাথে সাথে প্রশ্ন উঠে নবীদের সম্পর্কে। তাঁরা জীবিত না মৃত? কারণ নবীগণ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম বান্দা। যদি কেউ বলে যে, না নবীরা মৃত আর অলীরা জীবিত, তাহলে তার এই কথা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নিজ অলীদের নামের পূর্বে তারা নবীগণের নাম দায়ে পড়ে জুড়ে দিয়েছে। নচেৎ লক্ষাধিক সম্মানিত নবী পৃথিবীতে এসেছেন এবং চলে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে কতজন নবীর উম্মত তাদের নবীগণের কবরের উপর গম্বুজ তথা প্রাসাদ নির্মাণ করে সে স্থানে অবস্থান করছে? মাযার ভক্তরা কতজন নবীর কবরে নয়রানা-উপটৌকন পেশ করছে? তারা কতজন নবীর উরুস পালন করছে? করছে শুধু তাদের নিজ নিজ পীরদের। আসলে নবীগণের শুধু নামই নেয়া হচ্ছে আর যাবতীয় সম্মান, কারামতী, অলৌকিক ক্ষমতা এবং নয়র-নেয়ায দেয়া হচ্ছে মৃত অলীদেরকে। আমি এই মন্তব্য দ্বারা নবীদের জন্যও এরূপ করা হোক তার সমর্থন করছি না বরং পীরতন্ত্রের তিক্ত সত্যতা প্রকাশের সামান্য চেষ্টা করছি মাত্র। সম্মানিত নবীগণের কবরের উপর তাদের উম্মতেরা না তো গম্বুজ নির্মাণ করেছে আর না সেখানে বাৎসরিক মেলা বসিয়ে কবরস্থ নবীগণের নিকট চাওয়া-পাওয়া করছে। দেখেছেন কি কোথাও ইয়াকুব (عليه السلام) এর মাযার? ইব্রাহীম কিংবা ইসমাইল (عليه السلام) এর মাযার? আইয়ুব কিংবা যাকারিয়া তথা অন্যান্য নবীদের মাযার? যদি এক দুটির খবর কোথাও পাওয়া যায় তাহলে খতিয়ে দেখলে দেখবেন এসব বর্তমান কবরভক্তদেরই কারসাজী। উদ্দেশ্য সেটাই, নবীদের দোহাই দিয়ে অলীদের তথা কবর-মাযারের সমর্থন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবী ও রাসূল শব্দের সংজ্ঞা, তাঁদের সম্মান এবং চিরঞ্জীব কে ? তার বর্ণনা ।

ক- রাসূল, নবী এবং অলীর সংজ্ঞা :

আসল আলোচনায় উপনীত হওয়ার পূর্বে রাসূল, নবী এবং অলী কাকে বলে? তার বর্ণনা দেওয়া ভাল মনে করছি, কারণ এই শব্দগুলি বারংবার উল্লেখ হয়েছে এবং সামনেও বারংবার আসবে ।

রাসূল : রাসূল শব্দটির অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, দূত, বার্তাবাহক, সংবাদদাতা । যেহেতু রাসূল আল্লাহর বার্তা মানুষের মাঝে পৌঁছে দেন, সেহেতু তাঁকে রাসূল বলা হয় ।

শরীয়তের পরিভাষায় রাসূল হচ্ছেন : সেই পুরুষ ব্যক্তি যার প্রতি আল্লাহর বিধানের প্রত্যাদেশ (অহী) হয়েছে এবং উক্ত বিধান প্রচারের আদেশ করা হয়েছে । [আক্বীদা বিষয়ক শব্দাভিধান/১৯৩, ফিক্‌হ বিশ্বকোষ, শব্দঃ “রাসূল”, ২২ খণ্ড/২০৯]

প্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ (عليه السلام), শেষ রাসূল হচ্ছেন মুহাম্মদ (ﷺ) এবং আদম (عليه السلام) হলেন প্রথম নবী, রাসূল নন । [শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেতিয়াহ/৫০-৫১]

নবীর সংজ্ঞা : নবী সেই সম্মানিত ব্যক্তি যার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে (অহী) প্রত্যাদেশ হয়েছে কিন্তু তা প্রচারের আদেশ করা হয়নি । অর্থাৎ নবী ও রাসূল উভয়ের প্রতি অহী করা হয় । তবে পার্থক্য হল, নবী মুমিন গোত্রে প্রেরিত হন তাঁর পূর্বের নবীর বিধান প্রচারার্থে । যেমন, বানু ইসরাইলদের নবীগণ, তাঁরা তাদের কাউমকে তাওরাতের বিধানের আদেশ করতেন । অনেক ক্ষেত্রে নবীর প্রতি বিশেষ বিষয়ে অহী আসে । আর রাসূল কাফের কাওমের কাছে প্রেরিত হন তাদের আল্লাহর ইবাদত ও একত্বের আহবান করার উদ্দেশ্যে । তাই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক

রাসূল অবশ্যই নবী, তবে প্রত্যেক নবী রাসূল নন। আর রাসূল নবী থেকে বেশি মর্যাদাবান। [আল্ ইরশাদ ইলা সহীহিল ইতেক্বাদ/১৭৯]

নবুওত ও রিসালত (নবী ও রসূলত্ব) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বিশেষ বান্দাদের প্রতি একটি অনুগ্রহ ও মর্যাদা, যা তিনি স্বয়ং নির্বাচন করে থাকেন। আল্লাহ বলেছেন : (আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করেন বার্তাবাহক) [হজ্জ/৭৫] এই সম্মান ও মর্যাদা পরিশ্রম, চেষ্টা, জ্ঞান, ইবাদত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা অর্জন করা অসম্ভব-অসাধ্য। [আল্ ইরশাদ/১৭৯, ফতহুল বারী, ৬/৪৩৫]

এই রকম নবী ও রাসূলের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩। [সহীহ ইবনে হিব্বান, ফতহুল বারী ৬/৪৩৫] তবে কুরআন মজীদে কেবল ২৫ জন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ হয়েছে। আমাদেরকে তাদের প্রতি বিশেষ ভাবে ঈমান আনতে হবে। আর যাঁদের নাম উল্লেখ হয়নি তাঁদের প্রতি ব্যাপক ভাবে ঈমান আনতে হবে। নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী ও রাসূল হবে না। তাঁকে ভালবাসা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর আনুগত্য করা আমাদের প্রতি জরুরী।

মনে রাখা ভাল, শেষ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর শরীয়ত, পূর্বের নবীগণের শরীয়তের সত্যায়নকারী ও রহিতকারী। তাই আমরা কেবল নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর শরীয়ত অনুসরণ করতে আদিষ্ট, অন্যদের নয়।

অলী কাকে বলে : অভিধানে অলী শব্দের কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। যেমন অভিভাবক, গার্জিয়ান, পৃষ্ঠপোষক, শাসক, সাহায্যকারী, প্রতিবেশী, বন্ধু প্রভৃতি। [আল্ মুজাম আল্ ওয়াসীত/১০৫৮]

আলোচ্য বিষয়ে বন্ধু অর্থটি বেশি প্রযোজ্য। তাই যখন বলা হয় অলি উল্লাহ, তখন তার অর্থ হয় আল্লাহর বন্ধু বা আল্লাহর প্রিয়। এই শব্দের বহুবচনে বলা হয় আউলিয়াউল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর অলীগণ।

শরীয়তের পরিভাষায় অলী : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর অলী। এর সপক্ষে আল্লাহর বাণী :
(أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ج (٦٢) الَّذِينَ

أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ط (٦٣) يونس/ ৬২-৬৩

অর্থ : (মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা দুঃখিত হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা, ঈমান এনেছে এবং পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে।) [ইউনুস/৬২-৬৩]

আয়াতটির দিকে দৃষ্টি দিলে অলী কে তা সহজে বুঝা যায়। আল্লাহ তাদের অলী বলেছেন যাদের মধ্যে আছে দুটি গুণ। একটি ঈমান আর অপরটি তাকুওয়া।

ঈমান হলো : আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর পক্ষ হতে নবী (ﷺ) এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সে সব বিধি-বিধান বিশ্বাস করা, স্বীকার করা এবং কাজে পরিণত করা। [শারহুত তাহাবিয়াহ/৮৫৯, নাওয়াকিয়ুল ঈমান আল ইতেকাদিয়াহ/৩৫]

তাকুওয়া হলো : নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী তার নির্দেশিত সৎকাজসমূহ সম্পাদন করা এবং নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত থাকা। [নযরাতুন নয়ীম, ৪/১০৮০]

এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তিই অলী। যার ঈমান ও তাকুওয়া যত বেশি সে তত বড় অলী। সে কারণে নবী ও রাসূলগণ হচ্ছেন সর্বোত্তম অলী। অতঃপর সিদ্দীকগণ, অতঃপর শহীদগণ অতঃপর বাকি নেক বান্দাগণ। [সূরা নিসা/৬৯]

সূফীবাদের সাধারণ লোকেরা সৎ লোকদের স্তর সম্পর্কে যাই ধারণা রাখুক না কেন কিন্তু তাদের প্রসিদ্ধ অলী বায়জীদ বোস্তামী সাধারণতঃ এই বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন : “সাধারণ মুমিন ব্যক্তির মর্যাদার যেটা শেষ স্থান, অলীদের মর্যাদার সেটা শুরু স্থান। আর অলীদের মর্যাদার যেটা শেষ স্থান সেটা শহীদদের

মর্যাদার শুরু স্থান। আর শহীদগণের মর্যাদার যেটা শেষ স্থান সেটা সিদ্দীকদের মর্যাদার শুরু। আর সিদ্দীকদের মর্যাদার যেটা শেষ স্থান সেটা নবীগণের মর্যাদার শুরু। আর নবীগণের মর্যাদার যেটা শেষ স্থান সেটা রাসূলগণের মর্যাদার শুরু স্থান .. ”।

[সূফীয়াই নকশ্ বন্দ / ৯৬ এর বরাতে শরীয়ত ও তরীকত/১২১-১২২]

অলী পরিভাষাটির আলোচনা শেষে সঙ্গত কারণে বলা যেতে পারে যে, বেলায়েত (অলীত্ব) কোন বংশের সাথে সম্পৃক্ত নয়, আর না বেশ-ভূষার সাথে। না কোন দেশের সাথে আর না কোন জাতির সাথে। অলীর জন্য জরুরী নয় যে, তার দ্বারা কারামত প্রকাশ পেতেই হবে, নচেৎ সে অলী হবে না। মোট কথা অলীর বাহ্যিক কোন আলামত নেই যার ফলে আপনি তাকে অলী বলবেন, অন্যকে না। বরং অলীর আলামত হচ্ছে, ঈমান ও তাক্বওয়া, যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় দেখার বস্তু নয়। তাই মুসলিম সমাজে অলী অবশ্যই আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কে? তা আমরা বলতে পারি না। আর না কেউ নিজেকে অলী বলে দাবী করতে পারে। কারণ ঈমান ও তাক্বওয়া হচ্ছে সৎ আমল। আর এই সৎ আমল মানুষকে দেখানোর বস্তু নয় আর না প্রকাশ করার জিনিস। এই রকম করলে রিয়া হওয়ার আশংকা আছে, যা থাকলে নেকী ধ্বংস হয়ে যায়। তাই মনে রাখা দরকার, যে নিজেকে অলী বলে দাবী করে কিংবা কারামতী দেখিয়ে নিজের অলী হওয়ার দাবী পাকা করে, সে আসলে আল্লাহর অলী নয় বরং শয়তানের অলী।

নবীগণ ও অলীদের মধ্যে পার্থক্য : সম্মানীয় নবী ও রাসূলগণের এমন কিছু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আছে, যা যে কোন অলীর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে অনেক সুউচ্চে যেমন :

১- নবী ও রাসূলগণের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে অহী (প্রত্যাদেশ) হয়। কিন্তু অন্য কেউ যত বড় অলী বা পরহেযগার হোক না কেন তার প্রতি কখনও অহী আসবে না।

২- নবী ও রাসূলগণ সাধারণতঃ মাসুম (নিষ্পাপ) কিন্তু অন্য কেউ যত বড় অলী কিংবা মুত্তাকী হোক না কেন সে নিষ্পাপ হওয়ার দাবী করতে পারে না।

৩- নবীগণ যখন ঘুমান তখন তাঁদের চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। তাঁরা ব্যতীত সকলের চোখ ও অন্তর এক সাথে ঘুমায়।

৪- মৃত্যুকালে তাঁদেরকে পৃথিবী কিংবা আখেরাতের জীবন চয়নের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত লোকদের কোন স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, তাদের প্রতি মৃত্যু অবধারিত হয়।

৫- নবী ও রাসূলগণ যে স্থানে মারা যান, তাঁদের সে স্থানেই কবর দেয়ার আদেশ আছে। কিন্তু অন্যান্য মানুষদের জন্য এই প্রকার কোন আদেশ নেই।

৬- মাটি নবীগণের দেহ মুবারক গ্রাস করে না, কিন্তু অন্যান্যদের খেয়ে ফেলে। [আদ দালীল আল ইল্মী/৪৭]

চিরঞ্জীব শুধু মাত্র মহান আল্লাহ :

যার মধ্যে জীবন আছে আর সেই জীবনের শেষ বা ধ্বংস নেই, এই রকম জীবনকে বলা হয় চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীবের গুণে গুণান্বিত কেবল মাত্র মহান আল্লাহ। তিনি বলেন :

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) د الفرقان/ ৫৮

অর্থ : (তুমি নির্ভর কর তাঁর প্রতি যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।) [ফুরকান/ ৫৮]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ

অর্থ : (আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।) [বাকারাহ/২৫৫]

তিনি আরো বলেন :

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين (المؤمن)
 অর্থঃ (তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই
 সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাকো, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।)

[আল মুমিন/৬৫]

বর্ণিত আয়াত সমূহ স্পষ্ট যে, চিরঞ্জীব গুণের অধিকারী কেবল
 মাত্র আল্লাহ। যদি কেউ এই গুণটির অধিকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য
 কাউকে মনে করে, তাহলে সে সৃষ্টিকে আল্লাহর এই গুণে
 শরীককারী হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে নবী ও রাসূলগণের মৃত্যুর প্রমাণ

কুরআনের আলোকে সুলায়মান (عليه السلام) এর মৃত্যু:

সুলায়মান (عليه السلام) এর মৃত্যুর সম্পর্কে আমরা প্রথমে পবিত্র
 কুরআনের বর্ণনা শুনবো। আল্লাহ বলেছেন : (আর আমি সুলায়মান
 (عليه السلام) এর অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ
 এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো। আমি তার জন্যে
 গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম, আল্লাহর
 অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কতক তার সামনে কাজ করতো। তাদের যে
 কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি তাকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি
 আশ্বাদন করাবো। তারা সুলায়মান (عليه السلام) এর ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ,
 ভাস্কর্য, হাওজের মত বড় আকারের পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত
 বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করতো। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার
 সাথে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে
 অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।) [সাবা/ ১২-১৩]

অতঃপর আল্লাহ তাঁর মৃত্যুর কথা এভাবে বলেছেন :

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْحِجُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ط (١٤) سبَا

অর্থঃ (যখন আমি সুলাইমান (ﷺ) এর মৃত্যু ঘটলাম, তখন মাটির পোকাই জ্বিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানালো, যা সুলায়মান (ﷺ) এর লাঠি খাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারলো যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।) [সাবা/১৪]

আল্লাহ তাআলার বাণী স্পষ্ট যে, তিনি সুলায়মান (ﷺ) কে মৃত্যু দেন। অর্থাৎ তিনি মৃত্যু বরণ করেন এবং মৃত্যুবস্থায় লাঠির উপর ভর দিয়ে অনেক দিন যাবৎ থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো যদি নবী সুলায়মান (ﷺ) এর মৃত্যু হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ যদি তাঁর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে যারা নবী নন বরং সাধারণ অলী, তাদের মৃত্যু হতে বাধা কোথায়? তারা কি নবী সুলায়মান (ﷺ) এর থেকেও উত্তম। আর যদি সুলায়মান (ﷺ) এর বেলায় আল্লাহ মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আমরা অলীদের বেলায় মৃত্যু শব্দটি বললে দোষ কোথায় ?

আমরা ইতিপূর্বে হুবহু কুরআন মজীদে সেই আয়াতটি তুলে ধরেছি যাতে সুলায়মান (ﷺ) এর মৃত্যুর বর্ণনা এসেছে। এবার সংক্ষিপ্তাকারে কুরআনের বিশ্লেষকদের কিছু উক্তি অনুধাবন করুন যে, তিনি কত দিন ধরে এই মৃত্যুবস্থায় ছিলেন। ইবনে কাসীর (রাহেঃ) বলেছেন : “আল্লাহ তাআলা এ স্থানে সুলায়মান (ﷺ) এর মৃত্যুর বর্ণনা দেন এবং কি রূপে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জ্বিনসম্প্রদায় হতে গোপনে রাখা হয়, তারও বর্ণনা দেন, যারা নবী সুলায়মান (ﷺ) এর অধীনে কঠিন কাজে নিয়োজিত ছিল। তিনি (ﷺ) তাঁর

লাঠির উপর ভর দিয়ে (মৃত্যুবস্থায়) দীর্ঘ সময় প্রায় ১ বছর যাবৎ থাকেন। অতঃপর মাটির পোকা লাঠিকে খেয়ে দুর্বল করে দেয়, তখন তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন জ্বিনেরা জানতে পারে যে, তিনি অনেক আগেই মৃত্যু বরণ করেছিলেন। অতঃপর এটাও জানা যায় যে, জ্বিনেরা গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। যদি রাখতো তাহলে এই কঠিন শাস্তিতে নিজেদের এতদিন যাবৎ আবদ্ধ রাখতো না। ” এই ধরনের উক্তি তফসীরে তাবারীতেও বিস্তারিত দেখা যেতে পারে। [ইবনে কসীর, ৬/৫০১, তাবারী, ২১-২২/৮৮]

মূসা (ﷺ) এর মৃত্যু:

এবার মূসা (ﷺ) এর মৃত্যুর ঘটনা তুলে ধরা হল। ইমাম বুখারী “আহাদীসুল্ আশ্বিয়া” নামক অধ্যায়ে মুসার অফাত অনুচ্ছেদে আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন : “মূসা (ﷺ) এর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতাকে পাঠানো হয়। ফেরেশতা আসলে তিনি তাকে থাপ্পড় মারেন। ফেরেশতা আল্লাহর নিকট ফিরে গিয়ে বলে : আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠালেন যে মরতে অনিচ্ছুক। আল্লাহ বললেন : তাকে গিয়ে বলঃ সে যেন কোন এক বলদের পিঠে নিজের হাত রাখে। হাতের নিচে যতগুলি পশম থাকবে প্রতিটি পশমের বদলে সে এক এক বছর বয়স পাবে। মূসা (ﷺ) বললেনঃ হে রব্ব ! তার পর ? আল্লাহ বলেন : তার পর মৃত্যু। মূসা (ﷺ) বলেন : তাহলে এখনই মৃত্যু দেয়া হোক। তিনি (ﷺ) সে সময় আল্লাহর নিকট দুআ করেনঃ তাকে যেন আরযে মুকাদ্দাসার (পবিত্র ভূমির) এতখানি নিকটে করে দেয়া হয়, যতখানি একটি ডিল ছুড়ে দিলে ব্যবধান হয়। আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন : আল্লাহর রাসূল বললেন : “যদি আমি সেখানে হতাম, তাহলে তোমাদেরকে রাস্তার ধারে লাল স্ত্রুপের নিচে তাঁর কবরকে দেখিয়ে দিতাম”। [বুখারী, নং ৩৪০৭]

হাদীসটি স্পষ্ট যে, মূসা (ﷺ) এর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে পবিত্র ভূমির নিকটে দাফন করা হয়। এখন কথা হল, মূসা (ﷺ) যিনি শ্রেষ্ঠ নবীগণের মধ্যে এক জন। যদি তাঁর মরণ হতে পারে, তাহলে অলীদের মরণ কেন হতে পারে না? এই সমস্ত নবীগণের মৃত্যুর ঘটনা যদি স্বয়ং নবী (ﷺ) বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে একথা তবুও কেন বলা হবে যে, নবী ও অলীরা মরে না।

একটি আপত্তি ও তার জবাব :

ইবনে খুযায়মা বলেন : অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মূসা (ﷺ) এক জন নবী হয়ে মৃত্যুর ফেরেশতাকে কিভাবে থাপ্পড় মারতে পারেন? তিনি কি আল্লাহর আদেশে প্রেরিত ফেরেশতা ও আল্লাহর আদেশকে অগ্রাহ্য করেন? অন্যদিকে ফেরেশতা হয়ে তিনি নিজের হেফাজত করতে পারলেন না? ব্যাপার কি?

বিদ্যানগণ বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা আসলে এই সময় ফেরেশতাকে নবী মুসার জীবন কঙ্ক করার জন্য পাঠান নি, বরং পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর তিনি মৃত্যুর ফেরেশতাকে এই কারণে থাপ্পড় মেরেছিলেন যে, সেই ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে বিনা অনুমতিতে মূসা (ﷺ) এর ঘরে প্রবেশ করেছিল। যে কারণে তিনি তাকে চিনতে পারেন নি যে, সে ফেরেশতা, না অন্য কোন মানুষ। যেমন ইবরাহীম (ﷺ) এর নিকট ফেরেশতা মানুষের সুরতে আগমন করলে তিনি তাদের চিনতে পারেন নি। ফলে তাদের উদ্দেশ্যে বাছুরের ভুনা গোশত পেশ করেছিলেন।

[ফাতহুল বারী, ৬/৫৩৮]

ইয়াকুব (ﷺ) এর মৃত্যু:

মহান আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব (ﷺ) এর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করতঃ আরব এবং বানু ইসরাঈলদের কাফের সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেন :

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ لَا إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا صَلِّحْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة ১১২)

অর্থ : (যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? তখন সে নিজ পুত্রগণকে বলেছিল আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে ? তারা বলেছিল আমরা তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের মাবুদের (উপাস্যের) ইবাদত করবো, যিনি এক অদ্বিতীয় এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকবো।) [বাক্বারাহ/১৩৩]

এ স্থানেও আল্লাহর বাণী স্পষ্ট যে, ইয়াকুব (عليه السلام) এর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার অসীমত করে যান। প্রমাণিত হয় যে, নবী ইয়াকুব মারা গেছেন। আর নবীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে বিগত অলীদের মৃত্যু হতে বাধা কোথায় ? তারাও মারা গেছেন এ বিশ্বাসে আপত্তিই বা কেন হবে ?

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যু:

আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যুর সম্পর্কে কয়েক স্থানে বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মধ্যে সূরা যুমারের ৩০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) (৩০) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (৩১) الزمر

অর্থ : (নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে তর্ক করবে।) [যুমার/৩০-৩১]

বিশিষ্ট মুফাস্সির ইমাম কুরতুবী বলেন : “এখানে নবীজীকে সম্বোধন করে তাঁর ও তাদের (মুশরিকদের) মৃত্যুর সংবাদ দেয়া

হয়েছে”। অতঃপর তিনি বিষয়টির পাঁচটি ব্যাখ্যা হতে পারে বলে মন্তব্য পেশ করেন। তার পর চতুর্থ ব্যাখ্যায় বলেন : যেন লোকেরা নবীজীর মৃত্যুর ব্যাপারে মতভেদ না করে যেমন বিগত উম্মতেরা অন্যদের ব্যাপারে মতভেদ করেছিল। [কুরতুবী, ৮/২৫৮]

ইবনে কাসীর বলেন : “নবীজীর মৃত্যুর সময় আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এই আয়াতটি নবীজীর মৃত্যুর দলীল হিসাবে পেশ করেন”। [ইবনে কাসীর, ৪/৬৮]

প্রমাণিত হল যে, প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মারা গেছেন। এবার প্রশ্ন হল, সমস্ত নবীগণের প্রধান যদি মারা যান তাহলে বিগত অলীরা মারা যাননি বা অলীরা মরে না এটা কোন্ ইসলামের বিশ্বাস। আর আল্লাহ যদি নবী (ﷺ) এর জন্য মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আমরা তা বললে হারাম কেন হবে?

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ أَفَأَنْتَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (১১১)) آل عمران

অর্থ: (এবং মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয় তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদপদে ফিরে যাবে ? এবং যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে যায়, তাতে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করবেন।) [আল ইমরান/১৪৪]

আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলার বাণী স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর পূর্বে যত সব নবী এসেছিলেন সবাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। অর্থাৎ মারা গেছেন। অনুরূপ মুহাম্মদও বিদায় নিবেন। তাই তাঁকে যদি হত্যা করে দেয়া হয় কিংবা তাঁর মরণ হয় তাহলে কি তোমাদের পূর্বের দ্বীনে ফিরে যেতে হবে ? কখনও না।

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ:

মুফাসসেরীন ও সীরাতবিদগণ এ বিষয়ে প্রায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে যখন সাহাবাদের মাঝে এই খবর প্রচার হয় যে, মুহাম্মদ (ﷺ) কে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে, তখন অনেকের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকের মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় যে, মুহাম্মদ যদি সত্যিকার নবী হত, তাহলে তাকে তার শত্রুরা হত্যা করতে পারতো না। তাই মুহাম্মদ যেহেতু মারা গেছে, সেহেতু এই দ্বীনে থেকে আর লাভ কি? অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করে সাহাবাদের সতর্ক করে দেন যে, মুহাম্মদেরও (ﷺ) এক দিন না এক দিন মৃত্যু হবে, যেমন পূর্বের নবীদের হয়েছে।

[তফসীরে তাবারী, ৩-৪/১৪১-১৪৫, ইবনে কাসীর, ১/৫৬১-৫৬২]

অতঃপর যেদিন নবী (ﷺ) মারা যান সেদিন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, নবীজীর দোস্ত এবং প্রথম খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) পূর্বে বর্ণিত এবং এই আয়াতটি পাঠ করে অন্যান্য সাহাবাদের জ্ঞাত করান যে, নবী (ﷺ) প্রকৃতপক্ষে মারা গেছেন।

বুখারী শরীফের আলোকে নবী (ﷺ) এর মৃত্যু এবং কাফন-দফন:

আল্লাহর নবীর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু বকর (রাযিঃ) তার ঘোড়ায় চেপে সুন্হ নামক স্থান থেকে আসেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে মসজিদে প্রবেশ করেন। কারো সাথে কথা না বলে আয়েশার নিকট যান। তার পর নবী (ﷺ) এর দিকে এগিয়ে যান তাঁকে ধারিদার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছিল। তিনি চেহারা মুবারক হতে চাদর সরিয়ে চুমু খান। অতঃপর কাঁদেন ও বলেন : আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক হে আল্লাহর নবী ! আপনার উপর আল্লাহ দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না; যেই মৃত্যু আপনার প্রতি অবধারিত ছিল সেই মৃত্যু আপনার ঘটে গেছে”। (এখানে দুই মৃত্যু বলতে ওদের

ধারণার কথা বলা হয়েছে যারা বলছিল যে, মুহাম্মদ (ﷺ) মারা যাননি বরং তিনি তাঁর রব্বের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। ফিরে আসলে তিনি তাদের উচিত শাস্তি দিবেন, যাঁরা তাঁকে এখন মৃত বলছে। অর্থাৎ এই ধারণায় নবীজীর এই মৃত্যুর পর আবার জীবিত হবার প্রয়োজন আছে নচেৎ তিনি তাদের শাস্তি কি ভাবে দিবেন? তাই আবু বকর (রাযিঃ) এই ধারণার খণ্ডন করে বলেন : হে নবী আপনার প্রতি একটিই মৃত্যু অবধারিত ছিল যা, ঘটে গেছে। দ্বিতীয় কোন মৃত্যু আর আপনার হতে পারে না।)

[ফতহুল বারী, জানায়েয অধ্যায়, ৩/১৪৮]

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আবু বকর (রাযিঃ) বের হন। দেখেন, উমর (রাযিঃ) লোকদের সাথে কথা বলছেন। তিনি উমরকে বসতে বলেন। উমর অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়বার বলার পরেও তিনি বসেন না। তাঁকে সেই স্থানে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর (রাযিঃ) একস্থানে বসে পড়েন। তেমনি লোকেরা উমর (রাযিঃ) কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরের দিকে ফিরে আসেন। আবু বকর (রাযিঃ) আম্মা বাদ ! বলার পর বলেন : তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের (ﷺ) ইবাদত করতে তারা জেনে রেখো তিনি অবশ্যই মারা গেছেন। আরবী শব্দগুলি এরূপ :

"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ"

“আর যে আল্লাহর ইবাদত করতে সে জেনে রাখো, তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু বরণ করেন না।”

আল্লাহ তাআলা বলেছেন : (এবং মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয় তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। যদি তার মৃত্যু হয় কিংবা তাঁকে হত্যা করে দেয়া হয়, তবে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে? (পূর্বের দ্বীনে ফিরে যাবে) যে কেউ পশ্চাদপদে ফিরে যায়, সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারে না এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কৃত করেন।) [আল ইমরান/১৪৪]

বর্ণনাকারী বলেন “আল্লাহর কসম ! আবু বকরের (রাযিঃ) তেলাওয়াতের পূর্বে মানুষেরা যেন জানতো না যে, আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। লোকেরা যেন তার কাছ থেকে জানলো। অতঃপর শ্রবণকারী সবার মুখে মুখে আয়াতটি উচ্চারিত হতে থাকলো”। [বুখারী, জানাযা, নং ১২৪১-১২৪২]

উমর (রাযিঃ) বলেন : “আল্লাহর কসম ! আমি যখন আবু বকর (রাযিঃ) কে এই আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনলাম, তখন আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম যেন আমার পা থেকে যমীন সরে গিয়েছিল। এমন কি আমি মাটিতে বসে পড়লাম। আমি বুঝতে পারলাম অবশ্যই নবী (ﷺ) মারা গেছেন”। [বুখারী, মাগাযী, নং ৪৪৫৪]

এটি একটি দিবালোকের মত উজ্জ্বল প্রমাণ যে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মারা গেছেন। সাহাবাদের মধ্যে তর্ক বাধলে আবু বকর (রাযিঃ) তাদেরকে কুরআনের দলীল দ্বারা এবং নিজের যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দেন। এর পরেও যদি কোন দল মনে করে, নবী ও অলীর মরে না, তাহলে তাদের কে বুঝাবে ?

নবী (ﷺ) মারা গেছেন বলেই অন্যান্য মৃত মানুষদের যেমন দাফন কাফন করা হয়, কবর দেয়া হয়, তেমনি নবী (ﷺ) এর ক্ষেত্রেও করা হয়েছে। মৃত্যুর পর নবী (ﷺ) কে একটি ইয়েমেনী চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। মঙ্গলবারে নবী (ﷺ) কে কাপড়সহ গোসল দেওয়া হয়। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ নেন : আব্বাস, আলী, আব্বাসের দুইপুত্র ফযল এবং কুসাম (রাযিঃ) এবং নবীজীর স্বাধীনকৃত দাস। গোসলের পর তিনটি সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা কাফন দেয়া হয়। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না। অতঃপর তাঁকে সেই স্থানে দাফন করা হয়, যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল আর সেটা ছিল আয়েশা (রাযিঃ) এর ঘর। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) পালাক্রমে দশ দশ জন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশপূর্বক জানাযার নামায আদায় করেন।

[আবু রাহীকুল মাখতুম, ২/৩৮২-৩৮৩, বুখারী, কিতাবুল জানাযিয এবং আশ্বীয়া]

সমস্ত নবীগণের মৃত্যু:

আল্লাহ তাআলা বলেন :

(وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَآئِينَ مِّتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ (৩৬))

অর্থ : (আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরজীব করি নাই; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীব হয়ে থাকবে?) [আম্বিয়া/৩৬]

বুঝা গেল, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর পূর্বে যত লোক পৃথিবীতে এসেছিল সবার মৃত্যু হয়েছে। আর এটাও সত্য যে, তিনি ছিলেন শেষ নবী তাই তাঁর পূর্বে যত নবী এসেছিলেন তারা কেউ অনন্ত জীবন পান নি বরং তারা সকলে মারা গেছেন।

অনুরূপ বাণী পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, যেমন আল্লাহ বলেছেন :

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) آل عمران

অর্থ : (এবং মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয় তাঁর পূর্বে নবীগণ বিগত হয়েছেন।) [আল ইমরান/১৪৪]

যদি সমস্ত নবীগণের মরণ হতে পারে তাহলে বিগত অলীগণের মরণ হবে না কেন? আর আল্লাহ যখন নবীগণের সম্পর্কে স্পষ্ট মৃত্যুর কথা বলেছেন, তা সত্ত্বেও আমরা কেন বলছি যে নবী ও অলীরা মরে না?

অলী, সাধারণ মানুষ এবং সকল জীবের মৃত্যু :

ইতিপূর্বে আমরা সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের মৃত্যুর আলোচনা করেছি। এবার তাঁরা ব্যতীত সকল মানুষ এবং জীবনের অধিকারী সকল প্রাণীর মৃত্যুর সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা শ্রবণ করুন। আল্লাহ বলেন:

(أَيُّنَمَا تَكُونُوا يُذَرِّكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ)

অর্থ : (তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর।) [নিসা/৭৮]

বুঝা গেল, মৃত্যু থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। সে সবাইকে গ্রাস করবে। সে নবীদের চেনে না অলীদেরও চেনে না। এই রকম নয় যে, সে অলীদের ছাড়া অন্যদের পাকড়াও করবে। তাই মনে

রাখতে হবে, বিগত অলীদের মৃত্যু পাকড়াও করেছে বলে তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, মারা গেছেন।

আল্লাহ অন্যত্রে বলেন :

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (১০৭) العنكبوت

অর্থ : (জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।) [আন্ কাবূত/ ৫৭]

আল্লাহর এই সতর্কবাণী সূরা আশ্বীয়ার ৩৫ নম্বর আয়াতে ও সূরা আল ইমরানের ১৮৫ নম্বর আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সব আয়াতে আল্লাহর বাণী খুবই স্পষ্ট যে, যার জীবন আছে, তার অবশ্যই মরণ আছে। মনে রাখা দরকার যে, অলীগণও জীবনের অধিকারী ছিলেন, তাই তাদেরও মৃত্যু আছে। অলীরা মরে না এমনটা নয়। বরং এ কথা বলা মানে কুরআনের এসব আয়াতের বিপরীত স্থান নেওয়া।

মরণ সম্পর্কে দার্শনিকদের দর্শন: মানুষ মাত্রই মরণশীল

দর্শন হচ্ছে, যুক্তি ও প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। এই তত্ত্ব বহু প্রাচীন। এখনও স্কুল কলেজে এই বিদ্যা গৌরবের সাথে পঠন-পাঠন হয়। তাদের নিকট একটি খুবই সুপ্রসিদ্ধ দর্শন হচ্ছে : "Man is mortal" অর্থাৎ : মানুষ মরণশীল। তাই দর্শন অনুযায়ীও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, বিগত নবী, রাসূল ও অলীগণ মানুষ ছিলেন, আর মানুষ হচ্ছেন মরণশীল তাই তাঁরা মারা গেছেন।

বিবেকও তাই বলে, কারণ যে সমস্ত অমর অলীর কথা শোনা যায়, তাদের জীবনী পাঠ করলে তাদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ পাওয়া যায়। যদি তাদের মরণ না হতো তো মৃত্যু তারিখ লেখা হত না। তাদের মৃত্যু হয়েছে বলেই তাদের মৃত্যু তারিখ লেখা হয়েছে। বিবেক আরও বলে : মানুষ মারা গেলে তাকে কবর দেওয়া হয়। জীবিত কোন ব্যক্তিকে কবর দেয়া শরীয়ত এবং জাগতিক

আইনানুযায়ী হত্যা করার সমান। তাই যে সমস্ত অলীদের কবর দেয়া হয়েছে অবশ্যই তাদের মরণ হয়েছে বলেই কবর দেয়া হয়েছে। নচেৎ জীবিত সত্ত্বেও কবর দেয়া তো দণ্ডনীয় অপরাধ ! এই রকম অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি আছে কি ?

আপত্তি: অলীদের মরণ তো হয়েছে কিন্তু তারা পুনরায় জীবিত হয়েছেন:

সুচিন্তাবিদ পাঠকবৃন্দ ! নবী ও অলীদের মৃত্যু সম্পর্কে আমরা আপনাদের সম্মুখে যে সব তথ্যাদি তুলে ধরেছি, সেই সমস্ত তথ্য কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে গৃহীত। আমরা নিজ থেকে কোন কিছু বলার চেষ্টা করিনি। এসব স্পষ্ট জ্বলন্ত প্রমাণ অস্বীকার করার গর্হিত দুঃসাহস সহজে কোন মুসলিম ভাই করতে পারে না। তাই যারা কবরে অলীদের জীবিত মনে করে তারাও এসব প্রমাণাদি সরাসরি অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু নিজের আকীদা সজীব রাখার জন্য বলে থাকে : হ্যাঁ মৃত্যুর স্বাদ যেহেতু সমস্ত মানুষকে আশ্বাদন করতে হবে তাই অলীগণের মৃত্যু ক্ষণিকের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু কবরে আবার তাঁদের আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তাঁরা পৃথিবীর জীবনের ন্যায় জীবিত হয়ে যান।

প্রথমতঃ আমরা বলবো, কবরে রুহ ফিরে পাওয়াটা কোন বড় বৈশিষ্ট্য নয় কারণ শরীয়তের প্রমাণানুযায়ী কবরে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার রুহ ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং ফেরেশতার তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। [আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব নং ২৬, হাদীস নং ৪৭৩৮]

দ্বিতীয়তঃ যদি তারা পৃথিবীর জীবনের মত জীবনের অধিকারী হন, তাহলে প্রশ্ন আসে পৃথিবীর জীবনে মানুষকে অস্বিজে নিতে হয়, খাবার খেতে হয়, মল-মূত্র ত্যাগ করতে হয় এবং আলো বাতাস সহ প্রভৃতি কিছুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু অলীদের এসব কিছুর প্রয়োজন হয় কি হয় না ? যদি বলা হয় : হয় না। তাহলে বলবো : তাঁদের জীবন তাহলে পৃথিবীর জীবনের ন্যায় হল না। কারণ পৃথিবীর জীবনে এসব কিছুর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাছাড়া

পৃথিবীর জীবনে মানুষ চলা ফেরা করে, কথা বলে, দেখে, শোনে, পারলে অন্যের সহযোগিতা করে। কবরেও কি অলীরা এসব কিছু করে থাকেন? যদি কেউ বলে : হ্যাঁ এই রকম করেন, তাহলে তার দাবী হবে মিথ্যা। কারণ যে কোন অলীর কবরে যে কোন সময়ে যদি কেউ গিয়ে ডাকে কিংবা তার সাথে কথা বলে তো ভিতর থেকে হুঁ-হাঁর কোন শব্দ আসবে না। আর যদি কেউ বলে : কথা-বার্তা তো কেউ বলে না কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ভক্তদের সহযোগিতা করে থাকে, তাহলে বলবো : অন্য ভাবে পারে না কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে পারে। এটি কেমন কথা, কেমন যুক্তি! পারলে উভয় ভাবে পারা দরকার, না রহস্য অন্য কিছু?

সার কথা: এই অধ্যায়ের সার কথা হল, বিগত সমস্ত অলী এবং মর্যাদাবান নবী ও রাসূলগণ মারা গেছেন। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এটাই প্রমাণিত।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যুর পর অলীগণের ক্ষমতা! এ বিশ্বাসের খণ্ডন।

যারা মৃত অলীদের ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাদের এই বিশ্বাসকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১-অসাধারণ ও অতিরিক্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী :-

মৃত অলী-আউলিয়াদের ক্ষমতা সম্পর্কে অলীবাদের বিশ্বাস একটু ভিন্ন ধর্মী। তারা শুধু এতটুকুই বলে না যে, কবরস্থ অলীরা মুরীদদের তথা ভক্তদের কল্যাণ করতে ও অকল্যাণ দূর করতে সক্ষম। বরং এক ধাপ এগিয়ে বলে : অলীদের মৃত্যুর পর - তাদের ভাষায় - পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, তাদের জ্ঞান ও অনুভূতি, শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা পৃথিবীর জীবনের তুলনায় অনেক বেশী ও অধিক শক্তিশালী হয়। কারণ স্বরূপ তারা বলে : অলীগণ যেহেতু পৃথিবীতে বিভিন্ন জাগতিক কার্য-কলাপের সাথে জড়িত

থাকেন তাই তাদের ইহজগতে ক্ষমতা একটু কম থাকে কিন্তু এখানকার কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যখন পরজগতে চলে যান, তখন তাদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অনেক বেশি হয়, বৃদ্ধি পায়।

এর সপক্ষে সূফীবাদের মহারথীদের কিছু উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ে ‘এই বিশ্বাসের কতিপয় উদাহরণ’ শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো দু-একটির বর্ণনা দেয়া হলো :-

ক- খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতির ওরস উপলক্ষ্যে দাওয়াতী পত্রে এক ব্যক্তি লেখে : ‘তাহার এতই দয়া, কেহ তাহার দরবার হইতে খালি হাতে ফেরে না। অলি-আল্লাহর নেক দৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্তেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারে এবং আপনাকে শত বৎসর এবাদতের উর্ধ্ব তুলে দিতে পারে। আপনি খাজা সাহেবের নেক দৃষ্টি লাভ করুন। [শির্ক কি ও কেন?/২৮৮]

খ- ব্রেলাভী মতবাদের প্রসিদ্ধ ইমাম আহমদ রেযা খান বলেন : “আউলিআয়ে কেরাম মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম, অন্ধ এবং কুষ্ঠদের আরোগ্য দিতে সক্ষম এবং পৃথিবীকে এক পায়ে পঁচিয়ে নিতে সক্ষম”। [তাওহীদ কে মাসাইল/৮৬]

গ- তিনি আরো বলেন : “আউলিআয়ে কেরাম নিজ কবরে চিরন্তন জীবনের সহিত জীবিত আছেন। তাঁদের জ্ঞান ও অনুভূতি, শ্রবণ ও দর্শন পূর্বের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। [বাহারে শরীয়ত/৫৮]

এই বিশ্বাসের খণ্ডন :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অলীবাদের উচ্চ পদস্থ উলামায়ে কেরামগণ দাবী করেন ও বিশ্বাস করেন যে, কবরস্থ অলীদের শক্তি-সামর্থ্য পৃথিবীর জীবনের তুলনায় অনেক বেশি।

আমি বলবো : এই বিশ্বাস সুষ্ঠু বিবেকের বিপরীত এবং শরীয়তেরও বিপরীত। বিবেকের বিপরীত এই ভাবে যে, যদি কোন কর্মচারী তার মালিককে বলে যে, যখন আমি রাতে ঘুমাই তখন ডিউটির সময়ের তুলনায় বেশি কাজ করি, তাহলে তার এই যুক্তি

কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক বিশ্বাস করবে কি ? আপনি তার কথা গ্রহণ করবেন কি ? কখনই গ্রহণ করবেন না কারণ এটি একটি অবাস্তব এবং নিয়মের বিপরীত দাবী, যা কেউই গ্রহণ করতে পারে না। অনুরূপ যদি কেউ বলে যে, অমুক লোকটি মৃত্যুর পর বেশি শক্তিশালী হয়, তাহলে এই কথাটি হবে প্রকৃতির ও নিয়মের বিপরীত অবাস্তব কথা।

আর এই বিশ্বাস ও দাবীটি শরীয়তেরও বিপরীত। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ -

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ - وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ) ফাটর

অর্থ: (অন্ধ ও দৃষ্টিওয়ালা সমান নয়, না অন্ধকার ও আলো সমান, না ছায়া ও রৌদ্র, আর না জীবিত ও মৃত সমান।) [ফাতির/১৯-২২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ এমন দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যা আপসে সমান নয় বরং উভয়ে একেবারে একে অপরের বিপরীত বিষয়। যেমন আলো ও অন্ধকার, অন্ধ ও দৃষ্টিওয়ালা, ছায়া ও রোদ এবং মৃত ও জীবিত। এসব বিষয় এক নয়। কিন্তু যদি কেউ বলে : অন্ধকার আলোর চেয়ে উত্তম, কিংবা অন্ধ দৃষ্টিওয়ালা থেকে উত্তম, রোদ ছায়া হতে উত্তম আর মৃত জীবিত হতে উত্তম এবং শক্তিশালী, তাহলে এটা হবে কুরআন তথা আল্লাহর বাণীর বিপরীত কথা ও বিশ্বাস। তাই যারা মনে করে : মৃত অলীরা বেশি ক্ষমতাবান, তাহলে তাদের এই বিশ্বাস হচ্ছে কুরআনের বিপরীত, যা একেবারে প্রত্যাখ্যাত। কারণ কুরআন বলে মৃত ও জীবিত সমান নয়, আর তারা বলে : মৃত অলীরা বেশি ক্ষমতাবান।

২- অলীদের সাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাসী :

উপরোক্ত বিষয়টি ছিল মৃত অলীদের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয়। এবার তাদের সাধারণ ক্ষমতার কথা শুনুন। পীরবাদে তাদের মাযারস্থ অলীদের সম্পর্কে যেই ক্ষমতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে তা হলো : কবরস্থ পীর বাবারা তাদের মুরীদদের এবং অলীরা তাদের ভক্তদের মনের আবেদন, ইচ্ছা, আহ্বান, ফরিয়াদ শুনতে সক্ষম এবং কল্যাণ করার ও অকল্যাণ দূর করতে সক্ষম। সেটা সে নিজে করুক কিংবা মাধ্যম হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে করে দিক। এক কথায় মাযারস্থ অলীরা মানুষের ভাল করতে ও মন্দ দূর করতে সক্ষম। এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই মাযার ভক্তরা তাদের পার্থিব ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনাদি নিয়ে দরগাহে ছুটে যায় বাবাকে খুশি করার জন্য। সাথে নেয় নয়রানা উপটোকন। রোগীরা যায় আরোগ্য লাভের আশায়, চাকুরীহীনরা যায় চাকুরীলাভের আশায়, অপরাধীরা যায় ক্ষমা করানোর আশায়, মামলাকারীরা যায় মামলায় জয় লাভের আশায়, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা যায় জয়ী হওয়ার জন্য, আর অনেকে যায় এক অপরের দেখা-দেখি। মোট কথা, তাদের বিশ্বাস মাযারস্থ পীর বাবারা তাদের মুরীদদের অবস্থা জানার, আহ্বান শোনার ও পূরণ করার ক্ষমতা রাখে। এটা সূফীবাদ তথা পীরতন্ত্রের বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসের খণ্ডন :

সংক্ষিপ্ত খণ্ডন : যদি নবীগণ মৃত্যুর পর তাঁদের উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে না জানতে পারেন ও তাদের কল্যাণ করতে না পারেন, তাহলে অলীরা কিভাবে পারে ? এবার বিস্তারিত খণ্ডন পড়ুন।

১- নবী ঈসা (ﷺ) এর অজ্ঞতা ও অক্ষমতা : আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিনে তাঁর নবী ঈসা (ﷺ) কে সমস্ত লোকদের মাঝে ডেকে নাসারা সম্প্রদায়কে অধিক ভীতিপ্রদর্শন স্বরূপ বলবেন : (আর যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইবনে

মারইয়াম ! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মাবুদ বানিয়ে নাও? ঈসা (ﷺ) বলবেন : আপনি পূত-পবিত্র; আমার পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলবার আমার কোনই অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তবে অবশ্যই আপনি তা জানেন। আপনি তো আমার অন্তরের কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার অন্তরে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানি না; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত।) [মায়েরদাহ/১১৭] অতঃপর আল্লাহ বলেন :

(مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ط وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۱۱۷) المائدة

অর্থ : (আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এ ব্যতীত, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক, আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম, তবে যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনিই তাদের সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন; আর আপনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।) [মায়েরদাহ/১১৬-১১৭]

এ স্থানে আল্লাহ তাআলার বাণী স্পষ্ট যে, যখন আল্লাহ তাআলা নবী ঈসাকে ওফাত দেন, তখন থেকে তিনি তাঁর উম্মতের কৃতকর্মের সম্বন্ধে অবগত নন। কিন্তু যখন তিনি তাদের মাঝে জীবিত ছিলেন তখন তাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এবার প্রশ্ন হল, নবী হওয়া সত্ত্বেও যদি তিনি তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জানতে না পারেন এবং তাদের শির্ক করা থেকে বিরত রাখতে না পারেন, তাহলে সাধারণ অলীরা কবরের ভিতর থেকে কি ভাবে তাদের মুরীদদের অবস্থা জানতে পারে ? আর কি ভাবেই বা মুরীদদের কল্যাণ করতে পারে ?

বর্তমানে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর উম্মতের কৃতকর্মের সম্পর্কে অজ্ঞ:

শেষ নবী, প্রিয় নবী, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) কে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে ‘ হওজে কাউসার’ অর্থাৎ কাউসার নামক পানির জলাধার দান করবেন, যার দৈর্ঘ্যতা এক মাস রাস্তা অতিক্রম করার দূরত্ব সমান, তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাধা, মিসকে আশ্বরের চেয়ে সুগন্ধ, পাত্রগুলোর সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্ররাজীর সংখ্যার মত, যে ব্যক্তি এক বার সেই হাউজ হতে পানি পান করবে, সে আর কখনও পিপাসিত হবে না” ।

[বুখারী, রিক্বাক, নং ৬৫৭৯/মুসলিম, ফাযায়েল নং ৫৯২৮]

নবী (ﷺ) বলেন:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَ لَيُرْفَعَنَّ رِجَالُ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي،
فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدَثُوا بَعْدَكَ، وَ فِي
رَوَايَةٍ: فَأَقُولُ: سَخِفًا سَخِفًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي،،

“আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে হাউজে অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকবো। অতঃপর তোমাদের মধ্যকার কিছু লোককে আমার সামনে পেশ করা হবে, তারপর তাদেরকে আমার থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে তাদেরকে ফেরেশতাগণ হাউজ হতে তাড়িয়ে দিবেন। আমি বলবো : হে আমার রব্ব ! এরা তো আমার সাথী এদের তাড়ানো হচ্ছে কেন ? তখন বলা হবে : তুমি জানো না তোমার পরে এরা (দ্বীনে) কি নবাবিষ্কার করেছিল” । অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর নবীজী বলবেন : “সুহ্কান্ সুহ্কান্ লিমান গাইয়্যারা বা’দী” । অর্থাৎ দূর হও দূর হও যারা আমার পরে আমার দ্বীনে পরিবর্তন করেছে” ।

[বুখারী, অধ্যায়ঃ রাক্বাক, অনুচ্ছেদ : হাউজ, নং ৬৫৭৮-৬৫৯৩]

হাদীসে বর্ণনা স্পষ্ট যে, কেয়ামতের মাঠে নবীজীর হাউজে এমন কতক লোক পানি পান করতে আসবে, যাদের পানি পান

করার পূর্বেই তাড়িয়ে দেয়া হবে। নবীজী এই দৃশ্য দেখে আল্লাহর কাছে আবেদন করে বলবেন : হে আল্লাহ ! এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী, এরা তো আমার উম্মত। এদের আসতে দিন, পানি পান করতে দিন, হে আল্লাহ এদের তাড়ানো হচ্ছে কেন? অতঃপর নবীজীকে বলা হবে : তোমার মৃত্যুর পর এরা কি করেছে তুমি তা জানো না। এরা তোমার স্বচ্ছ দ্বীনে পরিবর্তন করেছে, নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে, আর অনেকে দ্বীন থেকে ফিরে গেছে।

বুঝা গেল, নবীজী এই প্রকার লোকদের চিনতে পারবেন না। নবীজীর মৃত্যুর পর তারা পৃথিবীতে দ্বীনে যা পরিবর্তন করেছে, তাও তিনি জানবেন না। বরং তাঁকে সেখানে তার সংবাদ দেয়া হবে। অতঃপর তিনি তাদের দূর হওয়ার আদেশ করবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি নবীগণের শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী তিনি যদি মৃত্যুর পর তাঁর ঐ সমস্ত উম্মতের কার্য-কলাপ সম্পর্কে জানতে না পারেন, যারা দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করেছে এবং তিনি কবর থেকে তাদের এই প্রকার জঘন্য কার্য-কলাপ হতে বাধা দিতে না পারেন, তাহলে কবরস্থ পীরেরা ও অলীরা কিভাবে জানবে যে, বাইরের জগতে মুরীদদের কি কি ঘটছে, কার কি প্রয়োজন এবং কিভাবেই বা তারা সেখান থেকে তাদের সমস্যার সমাধান করবে ? !! সম্মানীয় নবীগণ না পারলে পীরেরা কেমনে পারে ?

একটি ভাববার বিষয় :

যদি বর্তমান যুগের ও জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকজন জীবিত অলীকে কোন এক বন্ধ ঘরে রাখা হয়। আবারও বলি : সম্প্রতি সারা পৃথিবী জুড়ে যারা সবচেয়ে বড় অলী এইরকম দু-চারজন সম্মানীয় অলীকে যদি এক বন্ধ ঘরে রাখা হয়। আর গ্রামে-শহরে এবং দেশের লোকদের যদি খবর দেয়া হয় যে, অমুক স্থানে বর্তমান যুগের সেরা জীবিত অলীগণ অবস্থান করছেন। তাই আপনাদের যার যা কিছু প্রয়োজন আছে, তা পূরণার্থে নযর-নেয়ায

নিয়ে সেখানে ছুটে আসুন, যেমন দরগাহ ও মাযারে ছুটে যান। এবার শতাধিক লোক যদি নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণার্থে নয়র-নেয়ায, হাদিয়া ও উপটোকন নিয়ে সেখানে হাজির হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো, সেই বন্ধ ঘরে বসে থাকা জীবিত অলীগণ বলতে পারবেন কি? বাইরে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা কত? তারা কি কি উপটোকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে? তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি? আধুনিকতম কোন যন্ত্রও কি মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বলতে সক্ষম? যদি জীবিত এক দল অলী তাঁদের আসে পাশে উপস্থিত লোকদের এসব কিছু জানতে না পারে, তাদের মনের চাওয়া পূরণ করতে না পারেন, তাহলে বহুপূর্বে মৃত কবরস্থ অলীরা কিভাবে জানবেন যে, তার কবরের পাশে কে কে এসেছে? কতজন এসেছে, তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাই বা কি?

পঞ্চম অধ্যায়

বরযখী জীবনে নবী, শহীদ ও অলীগণ।

বরযখী জীবন বলতে কি বুঝায়?

বরযখ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আড় বা বেড়া। [আল্ কাম্বুসুল্ ওয়াজীয] মুফাস্সিরগণ বরযখের ব্যাখ্যায় বলেন : বরযখ হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে আড়ের নাম। কেউ কেউ বলেন: দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী সময়ে অবস্থানকারী, যাদের সম্পর্ক না তো দুনিয়াবাসীদের সাথে যারা পানাহার করেন আর না তো আখেরাতবাসীদের সাথে যাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী বদলা দেয়া হয়। অনেকে কবরকে বরযখ বলেছেন, যারা নাতো পৃথিবীবাসীদের অন্তর্ভুক্ত আর না তো আখেরাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। [ইবনে কাসীর, ৩/৩৫২]

মন্তব্য সমূহ একত্রিত করলে বলা যেতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হওয়া পর্যন্ত সময়সীমাকে বরযখ এবং বরযখী জীবন বলা হয়।

জীবনের স্তরসমূহ :

সাধারণতঃ কোন প্রাণীর মধ্যে যতক্ষণ রুহ বা আত্মা থাকে তাকে জীবিত বলা হয়। আর তার থেকে রুহ বা প্রাণ বিদায় নিলে তাকে মৃত বলা হয়। রুহের রহস্য আসলে আল্লাহ ব্যতীত কেউই জানে না। আল্লাহ বলেন :

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (১০)) (الإسراء)

অর্থ : (তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল : রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।) [বনী ইসরাঈল/৮৫]

এই রুহ যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকে সে অস্তিত্বে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। আসলে তার শেষ নেই লয়-ক্ষয় নেই। তবে সে চারটি স্তর অতিক্রম করে।

প্রথম স্তর : আদম (عليه السلام) এর পিঠে জন্ম লাভ। তখন থেকে নিয়ে মায়ের গর্ভে আসা পর্যন্ত প্রথম স্তর বা রুহের প্রথম স্থান। আল্লাহ তাআলা বলেন : ([হে নবী (ﷺ)]! যখন তোমার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? তারা সবাই উত্তর করলো হ্যাঁ ! আমরা সাক্ষী থাকলাম; (এই স্বীকৃতি ও সাক্ষী বানানো এই জন্য যে,) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পার, আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।) [আরাফ/১৭২]

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এক জাহান্নামীকে বলবেন : আদমের পিঠে আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে অংশী-শরীক করবে না; তা সত্ত্বেও তুমি শরীক করতে ছাড়নি”।

[বুখারী, অধ্যায় : আহাদীসুল আযিয়া, নং ৩৩৩৪]

বুঝা গেল, সকল আদম সন্তান আদমের পিঠে প্রকাশ পেয়েছিল এবং অঙ্গীকার করেছিল। আর এটাই হচ্ছে রুহের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব : মায়ের গর্ভে রুহ লাভের পর থেকে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে স্বীকৃত, তিনি আমাদেরকে বলেছেন :

(إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَظْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ ، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتْبِ رِزْقِهِ ، وَ أَجَلِهِ ، وَ عَمَلِهِ ، وَ شَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ ...)

অর্থ : “তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন ধরে শুক্র রূপে জমা হয়, পরবর্তী ৪০ দিন রক্ত পিণ্ডরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশদিন মাংস পিণ্ডরূপে থাকে, তার পর তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। অতঃপর সে তার মধ্যে রুহ প্রবেশ করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য হুকুম করা হয় : তার রুখী, বয়স, কাজ এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান ..”। [বুখারী এবং মুসলিম]

এই রুহ শরীরে প্রবেশ হওয়ার পর থেকে তার মৃত হওয়া পর্যন্ত হচ্ছে পৃথিবীর জীবন এবং রুহের দ্বিতীয় পর্ব।

তৃতীয় পর্ব :

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত দিবসে পুনরায় দেহে রুহ ফিরিয়ে দেয়া পর্যন্ত। এই স্তরকে বরযখী জীবন বলা হয়। এই সময়ের একটু বিশ্লেষণ এইরূপ যে, মানুষ মরে যাওয়ার পর মুনকার ও নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদের সময় মানুষের শরীরের সাথে রুহের সম্পর্ক পুনরায় আর একবার ঘটে।

চতুর্থ পর্ব :

হাশরের দিনে রুহ ফিরে পাওয়ার পর থেকে শেষ ঠিকানা পর্যন্ত , হয় জান্নাত না হলে জাহান্নাম। অনেকে তার পাপ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর পর রুহের সফর সমাপ্ত হয়ে যাবে। নবী (ﷺ) বলেছেন : “যখন জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে যবাই করে দেওয়া হবে। তারপর বলা হবে : হে জান্নাতবাসীরা ! এর পর কোন মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামবাসীরা ! এর পর আর কোন মৃত্যু নেই। যার ফলে জান্নাতবাসীদের আনন্দ আরো বেশি হবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ আরো বৃদ্ধি পাবে”।

[বুখারী, রাক্বাক, নং ৬৫৪৮]

বরযখী জীবন অদৃশ্য তথা গায়েবী জীবন :

দুনিয়াবী জীবন ছাড়া বাকি তিনটি স্তরই গায়েবী বিষয়। অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের কথা, যা আমরা স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিনি। বরং সে সবার খবর আল্লাহ এবং তার রাসূল দিয়েছেন বলে তা আমরা বিশ্বাস করি। তাই বরযখী জীবনের সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের প্রথমেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে, এ বিষয়টি হচ্ছে গায়েবী বিষয়। আমরা এ বিষয়ে নিজ

থেকে বানিয়ে কিংবা অনুমান করে কিছু বলতে পারি না। কারণ গায়েবের

জ্ঞানী একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ বলেছেন :

(وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ) الْأَنْعَام

অর্থাৎ, (অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জানেন না।) [আন আম/৫৯]

যেমন কোন ব্যক্তি আল্লাহর সম্পর্কে, তাঁর ফেরেশতাগণের সম্পর্কে, ভাগ্যের সম্পর্কে এবং জান্নাত জাহান্নামের সম্পর্কে নিজে বানিয়ে কিছু বলতে পারে না, বললে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে চরম অপরাধী বলে গণ্য হবে, কারণ গায়েবের জ্ঞানের মালিক কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলা। ঠিক তেমন কেউ বরযখী জীবন তথা কবর থেকে হাশর পর্যন্ত যা হবে তা নিজে বলতে পারে না। কিন্তু আমাদেরকে যতটুকু এই জীবনের সম্পর্কে আমাদের প্রতিপালক এবং নবী মুহাম্মদ (ﷺ) অবগত করিয়েছেন।

বরযখী জীবনের আরোও কিছু কথা :

১- বরযখী জীবন থেকে কেউই পৃথিবীর জীবনে ফেরত আসতে পারবে না। তাই পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যতসব মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব মারা গেছেন তাঁরা কেউই পুনরায় পৃথিবীতে ফেরৎ আসেন নি। আল্লাহ বলেন : (তাদের সামনে বরযখ (আড়) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।) [মুয়েনূন/১০০]

২- বরযখী জীবনের কথা-বার্তা : আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী (ﷺ) বলতেন : “যখন মৃতকে খাটে রাখা হয়, আর লোকেরা তাকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যেতে লাগে, তখন সে যদি নেক বান্দা হয়, তো বলে : আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো। আর যদি গুনাহগার বান্দা হয়, তাহলে সে তার সঙ্গীদের বলে : তোমাদের ধ্বংস হোক ! আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো ? তার শব্দকে মানব ব্যতীত সবাই শুনে। যদি মানব তা শুনতে পেত, তো অজ্ঞান হয়ে যেত। [বুখারী, জানাযা, অনুচ্ছেদ নং ৫২, হাদীস নং ১৩১৬]

৩ - বরযখী জীবনের চিৎকার : কবরের শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কীয় একটি লম্বা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ﷺ) সেই পাপী ব্যক্তির সম্পর্কে বলেন, যে কবরে ফেরেশতার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় আযাবের ফেরেশতা তাকে শাস্তি দিবে। “

অতঃপর সেই ফেরেশতা তাকে চরম আঘাত করবে, যার ফলে সে মাটির সাথে মিশে যাবে। পুনরায় তাকে পূর্বের মত করে দেওয়া হবে। আবার সেই ফেরেশতা দ্বিতীয়বার প্রহার করবে। পাপী ব্যক্তি চিৎকার করে আতর্নাদ করবে, যার চিৎকার জিন-ইনসান ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে। তার পর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে বলবে : হে আমার প্রভু ! যেন কিয়ামত না হয়। আর নেক ব্যক্তি হলে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হবে, জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার দৃষ্টি যতদূর যাবে, ততদূর পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে”।

[আব্দুদাউদ, হাকেম, আহমদ, তায়ালেসী, আহকামুল জানায়েয, আলবানী/২০২]

বরযখী জীবন, দুনিয়াবী জীবনের সাথে তুলনীয় নয়।

পূর্বে বর্ণিত দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াবী জীবনের সাথে বরযখী জীবনের কোন ক্রমে তুলনা হয় না। কারণ :
ক- দুনিয়াবী জীবন এবং বরযখী জীবন উভয় জীবনের স্তর ভিন্ন ভিন্ন এক নয়।

খ- বুখারী শরীফের হাদীসে স্পষ্ট যে, মাইয়েত সে নেককার হোক কিংবা গুনাহগার, যখন তাকে খাটে করে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে কথা বলে। কিন্তু তার কথা খাট বহনকারী লোকেরা শুনতে পায় না, অনুভবও করতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয় হল, মাইয়েতকে কথা বলার সময় ঠোঁট, মুখ এবং জিহ্বা নাড়াতে হয় না। কিন্তু পৃথিবীর জীবনে কথা বলতে হলে এসবের প্রয়োজন হয়, শোনা যায় এবং অনুভব হয়, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বরযখী জীবন দুনিয়াবী জীবনের মত নয়। তাই উভয়ের মধ্যে তুলনা করাও অবাস্তব।

গ- অন্য হাদীসে পাপী ব্যক্তির কবরে শাস্তিকালে চিৎকারের কথা এসেছে। সাধারণতঃ শব্দ ও চিৎকার মানুষ শুনে থাকে কিন্তু কবরের তথা বরযখী জীবনের দারম্ভ চিৎকারও মানুষ ও জিন শুনতে পায় না, যা দ্বারা বুঝা যায় বরযখী জীবন পৃথিবীর জীবনের মত নয়।

ঘ- আর দুই জীবনের কিছু পার্থক্য তো সবার কাছে স্পষ্ট যেমন : দুনিয়াবী জীবনে কোন ব্যক্তিকে মাটির ভিতরে রেখে উপরে ভাল ভাবে মাটি চাপা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা যাবে। কারণ ভিতরে সে অক্সিজেন পাবে না। কিন্তু বরযখী জীবনে ব্যক্তি, সেই সংকীর্ণ স্থানে জীবিত হয়, ফেরেশতার সাথে কথা বলে, নেক হলে আল্লাহর নেয়ামত অনুভব করে আর পাপী হলে শাস্তি পায়।

বরযখী জীবনে সম্মানিত নবীগণের অবস্থা :

সাধারণতঃ মানুষ মারা গেলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার দেহে পচন আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে মাটির দেহ মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় বান্দাগণের অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রে এই রকম হয় না; বরং মৃত্যুর পরেও তাদের দেহ মুবারক সতেজ থাকে। পচন ধরে না, গলে যায় না, মাটি তাদের দেহকে গ্রাস করতে পারে না। এটি তাদের বরযখী জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নবী (ﷺ) বলেন : “দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন জুমআর দিন, এই দিনে আদম (ﷺ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই দিনে তার রুহ কবজ করা হয়েছে, এই দিনে সিঁজায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনেই সমস্ত লোকেরা বেহুঁশ হবে। তাই এই দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরুদ আমার উপর পেশ করা হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন : হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদের দরুদ সমূহ আপনার উপর পেশ করা হবে অথচ আপনি ক্ষয় হয়ে যাবেন ? (বিলীন হয়ে যাবেন)। অতঃপর নবী (ﷺ) বলেন :

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ

السلام)

“অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মাটির উপর নবীগণের শরীর সমূহকে ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন”। [নাসাঈ, জুমআহ, বাব : ৫, নং ১৩৭৩/ আবু দাউদ, স্বালাত, ইবনু মাজাহ, ইক্বামাতুস সালাহ]

এটি হচ্ছে সমস্ত নবীগণের বরযখী জীবনের বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর বরযখী জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হল : তাঁর উপর সালাম পেশ করা হলে, উত্তর দেয়ার জন্য তাঁর রুহ তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেছেন :

(مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ
السلام) رواه أبو داود .

অর্থ : “যে কেউই আমার প্রতি সালাম পেশ করলে, আল্লাহ তাআলা আমার রুহকে ফিরিয়ে দেন, যতক্ষণে আমি তার সালামের উত্তর না দেই”। [আবু দাউদ, বাব : যিয়ারাতুল কবুর, নং ২০৪১]

বরযখী জীবনে শহীদগণের অবস্থা :

শহীদ সেই মহান ব্যক্তি, যে আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

[বুখারী, জিহাদ, নং ২৮১০]

প্রত্যেক মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান জিনিস হচ্ছে তার জীবন। এর চেয়ে অধিক মূল্যবাণ আর কিছু হয় না। মানুষ আল্লাহর পথে যত কিছুই ব্যয় করুক না কেন, তার পরে তার কাছে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু আল্লাহর পথে জীবনটি উৎসর্গ করে দিলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন প্রচার-প্রসার এবং তা সমুন্নত করতে গিয়ে নিজের জীবনকেও দান করে দেয়, এই রকম ব্যক্তিত্ব আল্লাহর নিকট অতিপছন্দনীয় এবং তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর বিশেষ রহমত, দয়া, ক্ষমা ও মর্যাদা। যেমন আল্লাহ বলেন :

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (১৬৭) ال عمران

অর্থ : (যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকা প্রাপ্ত হয়।) [আল ইমরান/১৬৯]

আয়াতটির সম্পর্কে সাহাবাগণ নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : “শহীদগণের রুহগুলো জান্নাতে সবুজ পাখির পেটে থাকে। তাদের জন্য আরশে বুলন্ত লঠন আছে। জান্নাতের যেখানে খুশি তারা বিচরণ করে। তার পর সেই লঠনগুলির নিকট আশ্রয় নেয়”। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ জিহাদ, নং ৪৮৬২]

এটা হচ্ছে বরযখী জীবনে শহীদগণের মর্যাদা ও অবস্থা।

বরযখী জীবনে অলীগণের অবস্থা :

যেহেতু বরযখী জীবন হচ্ছে গায়েবী বা অদৃশ্য জীবন, সে সম্পর্কে আমরা অতটুকুই বলতে পারি যতটুকু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের অবগত করিয়েছেন। তাই নবী, রাসূল ও শহীদগণের বরযখী জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ সুন্নতে যতখানি বর্ণিত হয়েছে ততখানি তুলে ধরা হল। এছাড়া বরযখী জীবনে অলীগণেরও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলে কিছু পাওয়া যায় না, তাই বরযখী জীবনে তাদের অবস্থা তাই নির্ধারিত হবে, যা সাধারণ মুমিনদের জন্য নির্ধারিত, যেমন হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কবরে তাদের রুহ ফিরিয়ে দেয়ার পর তাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : তোমার প্রতিপালক কে ? তোমার দ্বীন কি ? তোমার রাসূল কে ? এটা সেই মুহূর্ত যার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : (আল্লাহ তাআলা মজবূত বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করেন; পার্থিব জীবনে ও পরকালে।) [ইব্ রাহীম/২৭] তখন সেই মুমিন বান্দা উত্তরে বলবে : “আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মদ (ﷺ)। অতঃপর আকাশে আওয়াজদাতা আওয়াজ দিয়ে বলবে : আমার বান্দা সত্য বলেছে, তাই তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতের লেবাস

পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দরজা খুলে দাও”। কেয়ামত পর্যন্ত সে এই অবস্থায় থাকবে। [আবু দাউদ, হাকিম, আহকামুল জানাইয/২০২]

এইরকম মুমিন ও মুত্তাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন : (মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা চিন্তিত হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অর্জন করেছে। তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও) [সূরা ইউনুস/ ৬২-৬৪]

তবে এই আয়াত থেকে অলীরা কবরে জীবিত বা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী, এমন কিছু প্রমাণিত হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অলীগণ কবরে জীবিত, এই মতের দলীলাদির পর্যালোচনা।

যারা মনে করে : অলীগণ মৃত্যুর পরেও কবরে জীবিত আছেন কিংবা কবরে তাদের জীবন পৃথিবীর জীবনের থেকেও উন্নত মানের, তাদের রয়েছে কিছু দলীল। আসলে এসব দলীল নয় বরং সংশয় মাত্র। আমরা এ স্থানে তাদের কিছু প্রসিদ্ধ সংশয় তুলে ধরবো এবং জবাব দেবার চেষ্টা করবো :

প্রথম সংশয়: তারা বলে : অলীগণ মারা যায় না কারণ উল্লেখ হয়েছে :

(أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ)

অর্থ : “সাবধান ! অলীগণ মৃত্যু বরণ করেন না”।

উত্তর : প্রিয় পাঠক ! আরবী ভাষার এই বাক্যটি প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, যেন এটি কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীস। কিন্তু আসলে এটি না কুরআনের আয়াত আর না কোন হাদীস। বরং এটি তৈরিকৃত একটি আরবী বাক্য। হয়তঃ কোন আরবী বইয়ে এই বাক্য বর্ণিত হয়েছে। আর তারা সেটাকে দলীলরূপে মেনে

নিয়েছে। তাই যে কথা কুরআন কিংবা সুন্নতের অংশ নয় সেটি শরীয়তের দলীলও নয়। এইরকম বাক্য দ্বারা তারা জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে থাকে। নিজের আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণার্থে কুরআন বা হাদীসের অনুরূপ বাক্য তৈরি করতে তাদের দ্বিধা হয় না, আল্লাহর ভয়ে তাদের বুকও কাঁপে না ! [নাউয়ু বিল্লাহ]

দ্বিতীয় সংশয় : শহীদগণ মৃত্যুর পরেও জীবিত এটা সত্য ও প্রমাণিত ; তাই শহীদগণ জীবিত থাকলে অলীগণ জীবিত থাকবেন না কেন ?

উত্তর : তর্কের খাতিরে যদি কেউ এইরকম বিশ্বাসীকে বলে : মৃত্যুর পর সকল মানুষই কবরে জীবিত থাকে। কারণ যদি অলীগণ জীবিত থাকেন তো সাধারণ মানুষেরাও জীবিত থাকবে। তাহলে তারা অবশ্যই এইরকম যুক্তি পেশকারীকে বলবে : তুমি অজ্ঞ, মুর্থ এবং বেআদব কারণ তুমি অলী ও সাধারণ মানুষদের সমান মর্যাদার মনে করছো। কোথায় অলীদের অবস্থা আর কোথায় সাধারণ লোক ! উভয় প্রকার কি সমান হে নিবোধ ! যদি সে এতখানি বুঝে তো বলা উচিত হবে, শহীদগণ মৃত্যুর পরেও জীবিত তাই অলীগণও জীবিত এটা তাহলে কেমন যুক্তি ? কোথায় শহীদগণের মর্যাদা আর কোথায় তোমার অলী !

আসলে এই ধরনের লোকেরা অলী, অলীর কারামত ও কেচ্ছা-কাহিনী এত বেশি বলে বেড়ায় যে, সাধারণ লোকেরা মানব জাতির মধ্যে অলী নামক দলকে সর্বসেরা মনে করে নিয়েছে। আসলে নবী, রাসূল, সিদ্দীকীন এবং শহীদগণের মর্যাদা যে তাদের তুলনায় অনেক বেশি তা তাদের বলা হয় না। কারণ অলীর গুণ গাইলে তাদের স্বার্থ পূর্ণ হয় অন্যের গাইলে কি তা হবে ?

প্রিয় পাঠক ! শহীদগণ হলেন সেই মহান ব্যক্তিবর্গ যাঁরা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এক জন মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় কিছু আর দেওয়ার নেই। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁদের এই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا

يَشْعُرُونَ) البقرة

অর্থ: (আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারছো না)

[বাক্বারাহ/১৫৮]

তাদের এই জীবনের রূপ-রেখা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেন : “শহীদগণের আত্মাগুলো জান্নাতে সবুজ পাখির পেটে থাকে। তাদের জন্য আরশে বুলন্ত লঠন আছে। জান্নাতে যেখানে খুশি তারা বিচরণ করে। তার পর সেই লঠনগুলির নিকট আশ্রয় নেয়”। [মুসলিম, অধ্যায় : জিহাদ নং ৪৮৬২]

শহীদগণের সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নেতে এসব প্রমাণ এসেছে বলে আমরা তাদের মৃত্যুর পরেও বর্ণিত রূপে জীবিত মনে করি। কিন্তু অলীদের সম্পর্কে এই রকম কিছু বর্ণিত হয়নি বলে আমরা তাদের মৃত মনে করি। এটাই সত্য এটাই প্রমাণিত। শহীদগণের মর্যাদা চুরি করে অলীদের নামে প্রচার করার পিছনে রহস্য সেটাই যে, অলীদের কবরে জীবিত প্রমাণ করার মধ্যেই অলীবাদের ব্যবসা চলে নচেত বন্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় সংশয় : সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কবর খিয়ারতের সময় কবরবাসীকে সালাম দিতে হয়। আর সালাম তাদের দেওয়া হয় যারা সালাম শুনে ও উত্তর দেয়। বুঝা গেল কবরস্থানের মৃত লোকেরা শুনে। তাই কবরস্থ সাধারণ লোকেরাই যদি সালাম শুনে ও উত্তর দিতে সক্ষম হতে পারে তাহলে অলীগণ অবশ্যই হবেন। বুঝা গেল অলীগণ কবরে জীবিত।

উত্তর : তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী যদি মেনে নেওয়া হয়, কবরস্থ লোকেরা সবাই সালাম শুনে ও উত্তর দেয়, তাহলে প্রশ্ন হলো : এ ক্ষেত্রে অলীদের কোন বিশেষ মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য থাকলো কি ? কারণ সাধারণ লোকেরাও শুনে এবং অলীরাও শুনে, উভয়ে এ

ক্ষেত্রে সমান। তাই অলীদের এই কারণে জীবিত মনে করলে সাধারণ লোকদেরকেও জীবিত মনে করতে হবে, যেহেতু উভয় পক্ষই শূনার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু সাধারণ লোক এবং অলীগণ সবাই কবরে জীবিত এ কথা তো তারা বলেন না।

আসলে কবরে সালাম দেওয়ার হাদীসগুলি অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, সালাম বাক্যটি তো হাদীসে রয়েছে যেমন, মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে : “আস্ সালামু আলা আহলিদ্ দিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল্ মুসলিমীনা”। [মুসলিম, জানাইয, নং ২২৫৩]

তবে এই সালাম ইহকালের এক মুসলিম ভাইর অপর মুসলিম ভায়ের প্রতি সালামের ন্যায় ? যার উত্তর দেওয়া জরুরী। কিংবা কবরবাসীদের সালাম দিলে তারা পৃথিবীর সালামের উত্তরের মত উত্তর দেয় ? একথা হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এই অর্থ মাযারপছীরা নিজের স্বার্থেই গ্রহণ করেছে। তাই উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন : কবরে সালাম দেওয়াটা তাদের জন্য দুআ স্বরূপ অভিবাদন স্বরূপ নয়। [রুহ, আযাবি কবর আউর সিমাই মাওতা/৫০]

অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে তা সহজে বুঝা যায়। সেই সালামের অর্থ হচ্ছে, “হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি”। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, ইবনু মাজাহ] বলুন তো এর দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে অলীরা কবরে জীবিত ?

বিষয়টি আরোও পরিষ্কার হয় মুহাদ্দেসীনদের জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য দিলে, তাঁরা এই হাদীসগুলি কবরবাসীদের জন্য দুআ বা কবর যিয়ারতের দুআ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মাযার ভক্তরা এসব বরণ্য মুহাদ্দেসীনদের বুঝের বিপরীত বুঝেছে এবং বলেছে, এর দ্বারা বুঝা যায় অলীরা কবরে জীবিত ! আসলে অলীরা কবরে জীবিত প্রমাণ না হলে তাদের স্বার্থ অর্জন হয় না।

তাছাড়া এটি বরযখী জীবনের বিষয় আমরা তা দুনিয়াবী সালামের সাথে তুলনা করতে পারি না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ সংশয় : সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মাইয়েতকে দাফন করার পর যখন লোকেরা ফেরত আসে, তখন মাইয়েত কবরে তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। আর সাধারণ লোকেরাই যদি এ আওয়ায শুনতে পায় তো অলীদের ক্ষেত্রে তো এটা আরো বেশী সম্ভব। বুঝা গেল, অলীরা কবরে জীবিত।

উত্তর : আবার সেই উত্তরই প্রযোজ্য যে, যদি সব মাইয়েতই জুতার শব্দ শুনতে পায়, তাহলে এখানে অলীদের তো কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না। তাই এই বিষয়টি শুধু অলীদের জীবিত হওয়ার প্রমাণে কেন পেশ করা হবে? উচিত হবে তারা বলবে : সাধারণ লোকেরা এবং অলীরা সবাই কবরে জীবিত। কিন্তু তারা কেবল অলীদেরকই জীবিত বলছে, সাধারণ লোকদের না। অথচ দলীলটি সাধারণ এবং অলী সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আসলে মাইয়েতের দাফনে শরীক হওয়া লোকদের ফিরার সময় তাদের চপ্পলের শব্দ শুনতে পারা বিষয়টি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা মাইয়েতকে আফসোস, পরিতাপ এবং দুঃখ বেদনার অনুভূতি দেন যে, যাদের তুমি পৃথিবীতে আপন মনে করতে, যাদের সংস্পর্শে তুমি পৃথিবীতে আনন্দে-উল্লাসে মেতে থাকতে, তারা আজ তোমাকে একা ছেড়ে নিষ্ঠুরের মত ফিরে যাচ্ছে, তোমার কাছে কেউই থাকছে না।

এই বিষয়টি ব্যতিক্রম তাই হাদীসে এটা আসেনি যে, কবরের কাছে যে কেউ আসলে মাইয়েত তার চপ্পলের শব্দ শুনতে পায়। আর না এ কথা বলা হয়েছে যে, কবরের আশে পাশে লোকদের কথা-বার্তা মাইয়েত শুনতে পায়। কিন্তু মাযার ভক্তরা এর দ্বারা অলীরা কবরে জীবিত তা বুঝে নিয়েছে। কারণ সেটিই, অলীদের কবরে জীবিত প্রমাণ না করতে পারলে খানকাহ- দরগাহ আবাদ হবে না। আর আবাদ না হলে কিছু লোকের বিনা পুঁজির মধুর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

পঞ্চম সংশয় : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করলে তিনি উত্তর দেন। বুঝা গেল নবী (ﷺ) কবরে জীবিত। তাই তাঁর উত্তরসূরী অলীগণও জীবিত আছেন।

উত্তর : প্রথমত : শেষ নবী এবং শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে কথিত অলীদের তুলনা একেবারে অসমীচীন। কেবল অজ্ঞরাই এবং স্বার্থান্বেষীরাই তা করতে পারে। কোথায় মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোথায় তথাকথিত অলী !!

দ্বিতীয়তঃ নবী (ﷺ) কবরে জীবিত তাই তিনি উত্তর দেন, বিষয়টি কি এরকম না অন্য কিছু ? নিম্নের হাদীসটি অবলোকন করুন। নবী (ﷺ) বলেন :

ما من أحدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إلا رَدَّ اللهُ رُوحِي حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ
السلام (أبو داؤد ، حسن)

অর্থ : “যে কেউই যখন আমার প্রতি সালাম দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা আমার রুহ ফিরিয়ে দেন যেন আমি তার উত্তর দেই”। [আবু দাউদ, বাব : যিয়ারাতুল কবর, নং২০৪১]

স্পষ্ট যে, নবী (ﷺ) কবরে জীবিত নয়। তাই তিনি সালামকারীর সালামের উত্তর ততক্ষণে দিতে পারেন না, যতক্ষণে আল্লাহ তাআলা তাঁর আত্মাকে পুনরায় ফিরিয়ে না দেন। শ্রেষ্ঠ নবীর ক্ষেত্রে এইরকম নিয়ম যে আল্লাহ তাঁর রুহ ফিরিয়ে দেন অতঃপর তিনি উত্তর দেন। কিন্তু কথিত অলীদের রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাদের ভক্তদের সালাম বা আবেদন শুনার জন্য, এই রকম দলীল কোনো নথি-পত্রে আছে কি ? তা সত্ত্বেও যদি মনে করা হয় যে, কবরস্থ অলীরা জীবিত তাহলে কবর থেকে বাক্যালাপ করেই দেখাক। নচেৎ এই জঘন্য অন্ধ বিশ্বাসের এখানেই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত।

ষষ্ঠ সংশয় : কোথাও কিছু খনন করার সময় যদি কোন সতেজ লাশ পাওয়া যায়, তাহলে এই প্রকার লোকেরা বলতে শুরু করে : এই যে অলীর লাশ। অলীরা যে কবরে জীবিত থাকেন এটা তার বড় প্রমাণ। কারণ লাশটি সতেজ আছে, পচে-সড়ে যায়নি। তার পর শুরু হয়ে যায় দরগাহ নির্মাণ এবং সেই লাশের কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনী ও তার বংশের ও সিলসিলার বর্ণনা।

উত্তর : পূর্বে প্রমাণ সহ বর্ণিত হয়েছে, নবীগণের লাশ মাটি খায় না। কিন্তু নবী ও রাসূল ছাড়া অন্যদেরও খায় না, এই রকম প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবুও যদি কোথাও এই রকম লাশ পাওয়া যায়, তাহলে কি তা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, অলীরা কবরে জীবিত ? না কখনও না। কারণ লাশের সতেজ থাকা ভিন্ন বিষয় এবং লাশের জীবিত থাকা অন্য বিষয়। লাশের মধ্যে জীবন থাকলে সেটা লাশ হয় না বরং জীবিত মানুষ হয়। তাই কোথাও এইরকম সতেজ লাশ পাওয়া গেলেও লাশটি কথা বলে বা নড়া-চড়া করে, এটা কখনও শুনা যায় না।

বিষয়টি এই রকমও বুঝা যেতে পারে যে, বর্তমানে ডাক্তারেরা ঔষধের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন মৃত দেহকে বহু দিন ধরে হেফাজতে রাখে। আর মৃত দেহটি সতেজ তথা তরতাজা থাকে। কিন্তু সেটা কি জীবিত থাকে ? আসলে তা মৃত কিন্তু তাকে তরতাজা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। অনুরূপ কোন লাশ তরতাজা থাকতে পারে কিন্তু তা জীবিত হয় না।

তাছাড়া কোন লাশের তরতাজা থাকাটাই যে অলী হওয়ার প্রমাণ, এই ধারণাও ঠিক নয়। কারণ বিভিন্ন কারণে লাশটি তরতাজা থাকতে পারে, যেমন সেই কবর বা স্থানের আবহাওয়ার কারণে, যেমন প্রাচীন মিসরে বিশেষ উপায়ে মমী করার ঘটনা। বরং সেই মমীগুলি এখনও বর্তমান। কিংবা আল্লাহর রহমতে লাশ তরতাজা থাকতে পারে যেমন, নবী ও রাসূলগণের মৃতদেহ। কিংবা

আল্লাহর গজবেও তরতাজা থাকতে পারে, যেমন ফেরাউনের লাশ।
আল্লাহ তাআলা বলেন :

(فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

النَّاسِ عَنْ آيَتِنَا لَغَفْلُونَ ع (৭২) يونس

অর্থ : (অতএব আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করবো, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো ; আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে)। [সূরা ইউনুস/৯২]

মোট কথা, এই রকম খোঁড়া যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তারা অলীদেরকে কবরে জীবিত প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে থাকে। আর এটিই হচ্ছে দর্গাহ ও মাযারীদের মূল তবে গুপ্ত দরজা। কবরস্থ অলীগণকে জীবিত প্রমাণ করতে পারলেই আশ্তে আশ্তে বাকি দরজাগুলি উন্মুক্ত হয়ে যায়। বলা হয় : জীবিত তাই তারা মুরীদদের আহ্বান শুনে, নযর-নিয়ায গ্রহণ করে এবং সুপারিশ করে। আর এই ভাবে আবাদ হতে থাকে শিকের মণ্ডপ, মাযার ও দরগাহগুলি। পেট ভরতে থাকে স্বার্থান্বেষী এক সম্প্রদায়। (আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দেখাক। আমীন !)

অনেকে আমাকে অপবাদ দিবে:

কিছু সংখ্যক লোক তাদের স্বভাব অনুযায়ী আমাকে অপবাদ দিয়ে বলবে : এই লেখক অলীদের শত্রু, সে অলীদের ভালবাসে না, সে অলীদের সাথে বেআদবী করেছে, তার বই পড়া যাবে না, ইত্যাদি। তাই বইটি শেষ করার পূর্বে এই রকম ভাইদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট ভাষায় দুটি কথা লিখে দেওয়া সঙ্গত মনে করছি :

প্রথমতঃ অলী, যাদের আল্লাহ ভালবাসেন, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের আমিও অবশ্যই ভালবাসি এবং আমার মত আল্লাহর এক নগণ্য দাস, অলীদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা রাখার ক্ষুদ্রতম চিন্তাও

করতে পারে না। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল্ জামাআতের আকীদাহ এবং এটিই আমার বিশ্বাস। তাই উপরোক্ত কথাগুলি অপবাদ মাত্র। তারা এই রকম অপবাদ দ্বারা পাঠকদের সত্য গ্রহণ করা থেকে দূরে সরাতে চায়।

দ্বিতীয়ত : কিন্তু যে বিষয়ে লেখকের আপত্তি তা হল : কোন ব্যক্তির কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করে তাকে অলী মেনে নেওয়া অথচ অলীর কোন বাহ্যিক ও প্রকাশ্য আলামত বা প্রতীক নেই ; বরং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকীকে অলী বলেছেন। তিনি বলেন: (মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষণ্ণ হবে, তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অর্জন করেছে)। (গুনাহ থেকে বেঁচে থেকেছে) [সূরা ইউনুস/৬২-৬৩]

তাই অলী কেবল মাযার ভক্তদের সাথে নির্দিষ্ট হবে না ; বরং প্রত্যেক মুমিন ও মুত্তাকীই অলী বলে গণ্য হবে। আর এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী ও রাসূলগণ সব চেয়ে বড় অলী কারণ তারা সর্বোচ্চ মুমিন ও মুত্তাকী। অতঃপর সিদ্দীক, শহীদ, ও নেক বান্দাগণ সবাই অলী। শুধু দরগাহবাসীরাই অলী তা নয়, যেমন এই প্রকার লোকেরা মনে করে। তাইতো অলীর কথা আসলে তারা সরাসরি বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী বা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্তী বা অন্যের কথা মনে করে আর নবী ও রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক বান্দাদের বর্ণনা ছেড়ে দেয়।

তৃতীয়ত : আর যে বিষয়টিই লেখকের নিকট সব চেয়ে বড় আপত্তিকর তা হল : এর পরেও যাদেরকে তারা অলী মনে করছে, তাদেরকে আবার মৃত্যুর পরেও কবরে জীবিত বিশ্বাস করে তাদের কাছে চাওয়া পাওয়া হচ্ছে, সেটা সরাসরি হোক কিংবা অসীলা (মাধ্যম) করে হোক। অথচ কুরআন ও সহীহ সুন্নতের আলোকে তারা মৃত, দুনিয়াবাসীর কল্যাণ কিংবা অকল্যাণের সামান্যতম ও ক্ষমতা রাখে না।

চতুর্থতঃ পাঠক ভাইদের এ কথাই বলবো যে, বইটির তথ্যগুলি যদি কুরআন এবং সহীহ সুন্নত হতে সংকলিত হয়ে থাকে, তাহলে আপামর ধর্মপ্রাণ মুসলিম মিল্লাতের কর্তব্য হবে তা মেনে নেওয়া, অন্যের কথায় কর্ণপাত না করা।

উপসংহার

প্রিয় পাঠক সমাজ ! পরিশেষে বিষয় বস্তুর সারাংশ স্বরূপ একথা স্পষ্ট ভাবে বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, প্রত্যেক জীবের মরণ অবশ্যই আছে। তাই বিগত নবী, রাসূল, অলী এবং সাধারণ মানুষ সকলে মৃত্যু বরণ করেছেন। আর বর্তমানে যারা জীবিত আছে তারাও অবশ্যই মারা যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মরণের পর তাঁরা সকলে যেই স্থানে অবস্থান করছেন, সেই স্থানের নাম বরযখ। আর সেই বরযখী জীবন দুনিয়ার জীবনের মত নয়। তারা সেই স্থান থেকে না তো পৃথিবীতে ফিরে আসার ক্ষমতা রাখেন, আর না বর্তমানে পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন। অনুরূপ তারা দুনিয়াবাসীর কোন প্রকারের কল্যাণ ও ক্ষতি সাধনে একেবারে অক্ষম। তাঁরা তাঁদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান পাচ্ছেন ও শেষ দিবসে পাবেন। আমরা ও মরণের পর আমাদের কর্মানুযায়ী বদলা পাবো। যারা কবরস্থ অলীদের জীবিত মনে করে তারা যেমন কুরআন ও সহীহ সুন্নতের বিপরীতে অবস্থানকারী, তেমনি স্বার্থান্বেষীও বটে। কারণ এ বিশ্বাস প্রচারের মধ্যেই নিহিত আছে তাদের মান-সম্মান ও রুখী-রুটি। প্রকৃতপক্ষে অলীদের নামে এসব অসাধু কারবার।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১- আল্ কুরআনুল কারীম ।
- ২- তফসীরে ত্বাবারী, মুহাম্মদ বিন জাফর, দারু ইহ্ ইয়াইত্ তুরাস আল্ আরাবী, প্রকাশকাল : ২০০১ খ্রী : ।
- ৩- তাফসীরুল্ কুরআনিল আযীম, ইবনে কাসীর, দারু তাইবাহ, ১৯৯৭ খ্রীঃ/দারুদ্ দলীল্ আল্ আসারিয়াহ, ২০০৭ খ্রী : ।
- ৪- তাফসীরুল্ কুরতুবী, দারু আলামিল্ কুতুব, রিয়াদ, ২০০৩ খ্রীঃ ।
- ৫- কুতুবে সিভা (হাদীসের ছয়টি কিতাব) বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ ।
- ৬- ফাতহুল্ বারী, ইবনে হাজার, দারুস সালাম, রিয়াদ, ২০০০ খ্রীঃ ।
- ৭- মু'জামু আল্ফায়িল আক্বীদাহ, আবু আব্দুল্লাহ আল ফালিহ, মাকতাবাতুল্ উবাইকান, ১৯৯৭ খ্রীঃ ।
- ৮- শারহুল্ আক্বীদাতিল্ ওয়াসেতিয়াহ, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল্ উসায়মীন, দারুস সুরাইয়্যাহ, ২০০৩ খ্রীঃ ।
- ৯- আল্ ইরশাদ ইলা স্বহীহিল্ ইতেক্বাদ, ড.সালেহ আল্ ফাউয়ান, দারু ইব্ নিল জাউযী, ১৯৯৪ খ্রীঃ ।
- ১০- শারহুল্ ত্বাহাবিয়াহ, ইবনু আবিল্ ইয্য, মুআস্ সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রী : ।
- ১১- আররাহীকুল্ মাখতূম (বাংলা) সফীউর রহমান মুবারকপুরী, বায়তুস্ সালাম, রিয়াদ, ১৯৯৫ খ্রী : ।
- ১২- ফিক্হ বিশ্বকোষ, কুয়েত ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়, ২০০৫ খ্রী : ।
- ১৩- আহ্কামুল্ জানাইয, মুহাম্মদ নাসেরুদ্দীন আলবানী, মাকতাবাতুল্ মাআরিফ, রিয়াদ, ১৯৯২ খ্রী : ।
- ১৪- মাতা ইয়াশরিকু নূরুকা আইয়ুহাল্ মুন্ তাযার, উসমান বিন মুহাম্মদ আলখামীস, ২০০৪ খ্রী : ।
- ১৫- আদ দালীল আল্ ইলমী, ড. আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ ।

- ১৬- তাওহীদ কে মাসাইল (উর্দু), মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী, বায়তুস্ সালাম, রিয়াদ, ২০০৫ খ্রীঃ।
- ১৭- শরীয়ত ও তরীকত (উর্দু) আব্দুর রহমান কীলানী, মাকতাবাতুস্ সালাম, লাহোর, ২০০১ খ্রীঃ।
- ১৮- ইসলাম ম্যাঁ বিদআত ও য়ালালাত কে মুহাররেকাত (উর্দু), ড. আব্ আদ নান্ সুহাইল, দারুদদায়ী, ১৪২১ খ্রীঃ।
- ১৯- রুহ আযাবি কাব্র আউর সিমাই মাওতা (উর্দু), আব্দুর রাহমান কীলানী, আল কিতাব ইন্টার ন্যাশনাল, দিল্লী, ১৯৮৯ খ্রীঃ।
- ২০- শির্ক কি ও কেন ? ড. মুহাম্মদ মুযাম্মিল, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭ খ্রীঃ।
- ২১- হযরত বড় পীর (রহ) জীবনী, মাজহারুদ্দীন, নোমানিয়্যাহ কুরআন মহল, ঢাকা, ১০০০।
- ২২- আল্ মুজাম আল্ ওয়াসীত, আল মাকতাবাহ আল্ ইসলামিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক।
- ২৩- আল্ কামুসুল্ ওয়াযীয, ড. মুহাম্মদ ফযলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রীঃ।

دليانگما تہہ

میں دعا دلخ زب بیقہا ابد : سفیالت

(رجفخا) تلیالجا قیدہ بتحمب : قیدالما

